পড়া আর পড়ানো নিয়েই তিনি কাটালেন জীবনের বেশিরভাগ সময় - ডক্টর **মাহমুদ শাহ কোরেশী** [এম.এ. (ঢাকা), ডি.লিট (প্যারিস-সর্বন)]। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও প্রভোস্ট, স্যার এ.এফ. রহমান হল (চ.বি.); পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (রা.বি.) এবং মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী রূপে তাঁর অর্জন বিপুল প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। তাঁর কাজের স্বীকৃতি মিলেছে একুশে পদক এবং ফরাশি 'নাইট' সহ তিনটি উপাধি প্রাপ্তিতে। ফাঁকে ফাঁকে দেশভ্রমণ এবং অতি প্রিয় কিছু বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ রচনায় তাঁর সমধিক আগ্রহ। আমাদের শিল্প-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর নির্মোহ মূল্যায়নেও তিনি থেকেছেন নিমগ্ন। নির্বাচিত মহৎ মানুষদের জীবনী কিংবা স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ লেখাতেও তিনি সমান দক্ষ। অনুবাদ, বিশেষত ফরাশি কবিতার অনুবাদ - অবশ্যই তাঁর একটা প্রিয় কাজ। তবে এবার তিনি ঝুঁকেছেন অধ্যাত্ম-অনুভবের অনুপুঙ্খ বর্ণনার দিকে, আত্মজৈবনিকতার সংশ্লেষও ঘটেছে তার সঙ্গে।

২০০৪ সালে সস্ত্রীক হজে গিয়েছিলেন তিনি। যে-অমোঘ আকর্ষণে পৃথিবীর নানা প্রান্তর থেকে অগণিত নারী-পুরুষ সমবেত হন কাবা শরীফ চত্বরে, সেই আকর্ষণের অনির্বচনীয়তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর আপন সত্তায়। হজ সেরে এসে গ্রন্থে দিনলিপির আঙ্গিকে তিনি সেই উপলব্ধিকেই ভাষারূপ দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে দিয়েছেন নানা মানুষের সঙ্গে পথচলার অন্তরঙ্গ বিবরণ। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের সৌদী আরবের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পরিচিতি ও শাশ্বত আরবদেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রের বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ড. সরদার আবদুস সাত্তার

হজ সেরে এসে মাহমুদ শাহ কোরেশী

হজ সেরে এসে

মাহমুদ শাহ কোরেশী

হজ সেরে এসে

মাহমুদ শাহ কোরেশী

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ২০০৫
ফাল্গুন ১৪১১

প্রচ্ছদ | কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ | গণমুদ্রণ লিমিটেড
পোঃ মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১৩৪৪

মূল্য | **একশত বিশ টাকা মাত্র**

HAJ SHERE ESHE (Having Performed Haj) by Mahmud Shah Qureshi
Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100
First Edition : February 2005

Price : Taka 120.00 only, US$ 3.00

ISBN : 984-11-0577-X

'তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ,
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।'
রবীন্দ্রনাথ : স্ফুলিঙ্গ-১০৬

নাসরীন
ওরফে
সৈয়দা কমর জাবীন
ঐকান্তিক মমতা ও অনুপম সেবাদানে
যাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

২৫শে জানুয়ারি, ২০০৫ মাহমুদ শাহ কোরেশী

নিবেদন

এই বইয়ের নাম রাখা হল *হজ সেরে এসে*। একটু বিভ্রান্তিকর সম্ভবত। কিন্তু উপায় ছিল না। অনেকে আমার আগে এই বিষয়ে লেখা বইয়ের জন্য ভালো, ভাবগম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনামগুলো ব্যবহার করে ফেলেছেন। তাই হজ সেরে এসে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুলে বসলে এবং মক্কা-মদিনা ভ্রমণকালে লেখা ডায়েরীর পাতাগুলো ব্যবহার করতে গেলে এই তিনটি শব্দই বারবার কলমের ডগায় চলে আসে। তাছাড়া, হজ সম্পর্কে কোনো বই লেখার পরিকল্পনা আমার ছিল না। পরে লিখতে গিয়ে আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেয়েছি - সাধারণ পাঠক ও অন্যান্য স্বজনেরা যাতে আনন্দ পান পা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। আর তখন 'হজ সেরে এসে' কথাটা যেন Leitmotiv কিংবা গানের ধূয়ার মতো আমার কানে বাজতে থাকে।

অবশ্য মূল লেখাটা তো আমার মক্কা-মদিনার রোজনামচা। তবে যেখানে তা অসম্পূর্ণ কিংবা অস্পষ্ট, সেখানে 'প্রাককথন' ও 'পরিশিষ্ট' অংশগুলো নতুনতর পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণ করে কিছুটা স্বচ্ছ হবে বলে আশা করি।

সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস থেকে হজ করতে গিয়েও আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারিনি। সৌভাগ্যক্রমে দুটি ইংরেজি পত্রিকা *সৌদী গ্যাজেট* ও *এরাব নিউজ* মক্কা-মদিনায় সংগ্রহ করতে পেরেছি। ফলে সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে অকুস্থলে কী ঘটছে তা জানার ও জানাবার স্পৃহা আমার মনে জাগে। তাই একটা বাড়তি কাজ দাঁড়িয়ে গেল - পরিশিষ্ট : ১।

একটা বই লিখতে গেলে, ছাপতে গেলে অনেক সমস্যা দেয়া দেয়। আরবী ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ খুবই কঠিন কাজ। তবে তার এক বা একাধিক রীতি দাঁড়িয়ে গেছে শুদ্ধাশুদ্ধি বিবেচনা না-করে। আমাকে তা-ই অনুসরণ করতে হয়েছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজস্ব পদ্ধতি মেনে চলতে চেয়েছি। যেমন, আমি এই সফরের পর থেকে 'এশা' বলছি না, 'ইশা' বলছি, বহুকাল ধরে 'রেস্তোরাঁ' লিখি না, লিখি 'রেস্তোরঁ', মদিনা ও প্যারিসে উপর্যুক্ত উচ্চারণ শুনেছি বলে।

আজকাল বাংলা শব্দের বানান নিয়েও বহু সমস্যা। কতকগুলো ধ্বনি ও চিহ্ন মনে হয়, বাংলা থেকে অদূর ভবিষ্যতে লোপ পেয়ে যাবে। হ্রস্ব 'ই'কার, দীর্ঘ 'ঈ'কার তো আছেই, 'তিনি' লেখার পর 'তার' ব্যবহার আমার কাছে একটা অপরাধের শামিল। চন্দ্রবিন্দু কই? তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, এখন অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি হয়ে পড়ছে ক্ষীণতর।

বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আহমদ পাবলিশিং হাউস আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। এই প্রখ্যাত প্রকাশনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মহিউদ্দীন আহমদ সাহেবের সঙ্গে সত্তরের দশক থেকে পরিচিত হবার এবং তাঁর স্নেহধন্য হবার সুযোগ আমার রয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি তাঁর পুত্র মেসবাহউদ্দীন আহমদ পাশার সূত্রে আমি এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলাম।

বরাবরের মতো শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী দ্রুত একটি প্রচ্ছদলিপি প্রস্তুত করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। গণমুদ্রণ লিমিটেড সুষ্ঠুভাবে বইটি ছাপার কাজে সহায়তা দান করেছেন। এজন্য এই ছাপাখানার ব্যবস্থাপক খোরশেদ ভূঞা, কাউছার আহমেদ এবং অলক রায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

কোনো বিষয়ে কারো প্রশ্ন জাগলে বা কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে যে-কেউ আমাকে চিঠি লিখে জানাতে পারেন। বাধিত হবো।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫
লে'স্পোয়ার 'আশায় বসতি'
৬০/ই উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান
ঢাকা-১২০৫

মাহমুদ শাহ কোরেশী

সূচীপত্র

প্রাক-কথন ৯
যাত্রা হল শুরু ১৯
দিনলিপি ২২
উপসংহার ৭০

পরিশিষ্ট

সৌদী আরব : এখন ৭৪
হজ ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলার বিষয় ৭৪
সৌদী আরবে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৭৯
আরব দেশ : চিরন্তন ৯২
গ্রন্থপঞ্জি ১০৩

আলোকচিত্র

তাঁবুর শহর মিনা ১০৫
হজের স্মৃতি ১০৬
আরাফাতে নিমের ছায়া ১০৭
জামারাত : বড় শয়তানের অবস্থান নির্দেশক ১০৮
জবলে রহমতে প্রার্থনারত শাহ সাহেব ও সঙ্গীরা (অংশত) ১০৯
জবলে রহমতে উষ্টের পিঠে ১১০
মক্কায় এক দম্পতি ১১১
মদিনা : মসজিদে নববী ১১২
মসজিদে নববীর একাংশ ১১৩
সৌদী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ১১৪
মহাপ্রস্থানের পথে : ১ ১১৫
মহাপ্রস্থানের পথে : ২ ১১৬

প্রাক-কথন

হজ সেরে এসে যে কোন মোমিন মুসলমানের অর্থাৎ বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বীর অনিবার্য হয়ে পড়ে ধর্মে-কর্মে আত্মনিয়োগ করা, পর্যাপ্ত পরিমাণে নামাজ পড়া, কোরআন ও অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করা, বিবিধ সৎকর্মে তৎপর থাকা। অন্ততঃ এটাই করণীয় কর্তব্য বলে আমার মনে হয়েছে কিংবা ঐতিহ্য সূত্রে জানতে পেরেছি। কিছু কিছু সজ্জন আবার অন্য একটি কাজেও উঠেপড়ে লাগেন। তাঁরা তাঁদের যাপিত জীবনে এই যে এক অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা অর্জিত হল তার বর্ণনা লিখে অন্যদের দিয়ে যেতে চান। শুধু মুখে বয়ান করেও যথেষ্ট মনে হয় না। একটা লিখিত বিবরণ দিয়ে যেতে না পারলে নিজের কৃতকর্মটিকে যেন অসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে। এ রকম সজ্জন অগুনতি। আমাদের বাংলা ভাষায় তাই হজের বর্ণনা খুব কম নয়। সেজন্য বোধকরি হজ সেরে এসে আমি এক প্রকাশক সুধী ব্যক্তির কাছে যখন আমার এহেন বাসনার কথা ব্যক্ত করলাম, তিনি মনে হল মাথায় এক কলস ঠাণ্ডা পানি যেন ঢেলে দিলেন। কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রকাশ করলেন এক অনবদ্য অভিব্যক্তি : 'হইছে, হইছে। অনেকেই লিখছে ঐসব কথা। আপনি আর সময় নষ্ট কইরেন না।' এ ধরনের আরো কিছু তিনি বলছিলেন। আমি একটু থমকে দাঁড়ালাম। প্রায় মাসখানেক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম - লিখব কি লিখব না। যদিও লেখার ব্যাপারে আমি একজন কুঁড়ে বাদশা আবু হোসেন! তবু ঘটনাচক্রে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে দেখা যাচ্ছে লিখে যাচ্ছি অনুরোধে ঢেঁকি গিলে অর্থাৎ প্রবলভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে অথবা পেশাগত কারণে বাধ্য হয়ে এবং কদাচিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা তথাকথিত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। লেখাই জীবন না হলেও লেখালেখি জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। যেমন তেমন হোক, এই অধমেরও একটা লেখক পরিচিতি লোকসমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে।

এবারও কেন জানি না মনে হল না লিখে গত্যন্তর নেই। এমন অভিজ্ঞতা! উনচল্লিশ দিনের বেদনামধুর অলৌকিক জীবন! গতানুগতিক সংসার জীবনের বাইরে অথচ একেবারে বাইরেও নয়। আল্লাহ্‌র ঘরে গিয়ে আত্মনিবেদনের এই সুযোগ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? জোটে লক্ষ লক্ষ মানুষের - অবশ্য তাঁরা হচ্ছেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে-থাকা কোটি কোটির অংশভাক।

আমি তো কখনো ভাবিনি হজে যাবো, অন্ততঃ এ বছর যাবো। ১৯৭৭ সালে আমি উমরাহ্ করেছি। ঘটনাচক্রে গিয়েছিলাম জেদ্দা নগরীতে। ওআইসি সংস্থার সেক্রেটারি-জেনারেল ডক্টর আমাদু করিম গায়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য। তিনি আমাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য বিশেষভাবে একটি কথা বলেছিলেন, মনে পড়ে : 'এটা আল্লাহ্‌র জায়গা, তুমি পছন্দ করবে।' লম্বা কথা সংক্ষেপ করি : মক্কা-মদিনার সংক্ষিপ্ত সফর আমার জন্য যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি অন্তরের গভীরে একরকম প্রেরণাদায়কও ছিল। আমি যেন আমার উৎসমূলকে প্রায় ছুঁতে পেরেছি এ রকমও মনে হয়েছিল; কিন্তু সেখানে চাকুরী নিয়ে বসবাসের কথা ভাবতে পারিনি। অনেক বেশি পরিমাণ রুজি-রোজগারের নিশ্চিতি সত্ত্বেও। অল্প কিছুদিন আগে তখন আমি আমার নিজের জেলা চট্টগ্রাম ছেড়ে রাজশাহীতে চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং ক'মাসেই মনে হচ্ছিল যে এখানেই আমি থিতু হতে পারবো, পেরেওছিলাম। বিশ বছর প্রায় কাটিয়ে দিলাম সানন্দে। মোদ্দা কথা, মরুর দেশ কিংবা বহুগুণ বেশি মাস মাইনা আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। দেশে ফিরে অনেকের কাছে শুনলাম : 'উমরাহ্ যখন করে এসেছি 'হজ' এখন 'ফরজ্' হয়ে পড়েছে আমার।' হজ করতেই হবে। অবশ্য কখন, কেমন করে হবে তা জানি না। কেননা, বেশ টাকা-পয়সার সামর্থ্যও তো থাকতে হবে নাকি? সমাজের যে স্তরে আমার আনাগোনা, খোঁজখবর নিয়ে ঘোরাঘুরি কিংবা ঠিকমত তদবির করলে সরকারী 'টিমে' কিংবা ইরানী বা সৌদী 'গ্রুপে' ঢুকে বিনা খরচায় হজ সেরে আসা যেত! একবার বোধহয় 'না চাইতে এক কান্দি'র মতো এ রকম একটা সুযোগ হাতের কাছেই এসেছিল কিন্তু 'ভদ্রলোকের ঐ এক কথা'! সামর্থ্য হলে নিজের

পয়সায় যাবো। হজ তো সামর্থ্যবানদের জন্যই করণীয়, পালনীয় বলে জেনেছি। সুতরাং ভিক্ষুকের মতো গিয়ে লাভ কী? কথাটা হয়তো ঠিকভাবে বলা হলো না। তবু আমার মনের গড়নটাই এ রকম, কী করা যাবে!

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। গেল বছরের হেমন্তের এক অপরাহ্নে আমার স্ত্রী নাসরীন যখন হঠাৎ করে আমাকে বলে বসলো : 'আমরা এবার হজে গেলে কেমন হয়?' যদ্দূর মনে পড়ে, আমাকে কোনো একটা সুখাদ্য পরিবেশন করেই ও কথাটা পাড়ল। আমি কিছুটা সময় ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললাম : 'হ্যাঁ, খুব ভালো হয়। কিন্তু পয়সা কোথায়?'

'পয়সা হয়তো যোগাড় হয়ে যাবে। আগে তো নিয়তটা তোমার করতে হবে।'

বুঝলাম, মহিলা গোপনে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন। দু'তিন বছরের মধ্যে ওর বন্ধু শামা ও সদ্য-প্রয়াত আসিয়া পারভীন (সাবেক পূর্ত সচিব জিয়াউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী, আইনজীবী রোকন উদ্দিন মাহমুদের বোন) হজ সেরে আসার পর আমার স্ত্রীর মনেও একই অভিপ্রায় তীব্রতর হয়ে উঠেছিলো হয়তো।

কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, সত্যি সত্যি এতগুলো টাকা কোথা থেকে আসবে। কমপক্ষে তো তিন লাখ টাকার ধাক্কা! একটু রসিকতা করতে চাইলাম : 'ওহ, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে তাহলে টাকা কিছু জমেছে!' ওরে বাপরে! যেমন কথা তেমন জবাব : 'শাড়ির ভাঁজে থাকবে কেন? তুমি কি জানো না আমার কাছে আড়াই লাখ টাকার একটা ফান্ড আছে।' সত্যি তো! আমি ভুলে বসেছিলাম। অন্যদিকে আমারও একটা ব্যবস্থা আছে, যাতে বেশ বড় একটা অংক ঋণ নিতে পারি। সেজন্যে আমি প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোকটি আউড়ে থাকি :

ঋনং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
যাবৎ জিবেৎ সুখম্ জিবেৎ।

অর্থাৎ 'ঋণ করে হলেও ঘি খাও, যদ্দিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে।' অবশ্য ঋণ শোধ করার মুরোদ থাকতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি আমার সেটা রয়েছে। কেননা অবসর গ্রহণের পরও আমি এখন অবধি

কর্মরত। অন্যদিকে তিন ছেলেমেয়ের বিয়েশাদী সব শেষ। ঋণসমৃদ্ধ আর গিঞ্জি হলেও ঢাকা শহরের মর্যাদাবান এলাকায় ভদ্র পরিবেশে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করছি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এখনও বড় ধরনের রোগ থেকে মুক্ত রয়েছি। ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটি না-করেও মোটামুটিভাবে সুস্থ, সবল।

সুতরাং হজে তো আমাদের এখনই যাবার সময়। তবে আরেকটা অসুবিধার কথা উপেক্ষা করা যায় না।

আমাদের তিন বছরের নাতি রা'দ তার দাদির প্রতি অত্যধিক আসক্ত। তাকে সামলাতে হলে আমার মেয়ে প্রসন্না ও তার দেড় বছরের মেয়ে প্রমার প্রয়োজন। মেয়ে জানাল যে, উত্তরার নিজেদের বাড়ি থেকে এসে সে আমাদের কলাবাগানের 'লে'স্‌পোয়ার্' তথা 'আশায় বসতি' বাটিতে থাকবে। বাহ, অল্প দিনে সুন্দর পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল। বিশেষ করে আমার স্ত্রী নাসরীনের ফুপাতো ভাই ফুয়াদ যখন জানাল : নারিন্দার শাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে একটা কাফেলা যাবে। আমরা সেটাতে যাবার চেষ্টা করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্! নাসরীন ফোন করে বর্তমান শাহ্ সাহেব আমাদের মুরাদুল্লাহ-ভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলল। অন্যদিকে আমার ছোট ভাই নাদির শাহ কোরেশী - টিএন্ডটি বোর্ডের ডিরেক্টর, সেও হজে যাবার নিয়ত করে বসে আছে। কোনো দলভুক্ত হওয়াটা তার তখনো পাকা হয়নি। অতএব আমাদের সঙ্গে যেতে তার আপত্তি নেই।

শাহ্ সাহেবের কাফেলা 'পদ্মা ওভারসীজ' শীর্ষক একটি ট্র্যাভেল এজেন্টের মাধ্যমে যায়। আমরা যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি এ সময়ে খবর পেলাম চট্টগ্রাম থেকে আমার ছোট বোন খালেদা খানম ওরফে বুলবুলও আমাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রী হতে চায়।

কয়েক বছর হলো বুলবুলের স্বামী রবিউল হোসেন ইন্তেকাল করেছে। নিজে রসায়নবিদ, সে ছিল প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের রাজনীতিবিদ নজরুল ইসলামের ফুপাতো ভাই অর্থাৎ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আব্দুর রহমান সাহেবের বোনের ছেলে। বুলবুলের দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তিন ছেলে চাকুরী করছে। একটা ছোট বাড়িও করেছে সে, চট্টগ্রামের হালিশহরে। সুতরাং সে

মনে করলো দুই ভাই ও এক ভাবীর সঙ্গে হজে গেলে তার এই বড় বাসনাটিও পূর্ণ হতে পারে সুষ্ঠুভাবে। মেয়েদের জন্য যে একজন 'মাহরুম' প্রয়োজন হয়, সেটা নাদির শাহ হতে পারে, বিশেষতঃ ওর স্ত্রী দুই স্কুলগামী ছেলে নিয়ে ঢাকায় থাকছে।

প্রথম দিকে মনে হয়েছিল ফুয়াদও আমাদের কাফেলায় শরীক হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে এবার হজে গমন সম্ভব হলো না। কিন্তু ওর বড়ভাই ফারুক অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বনামধন্য এডিশনাল সেক্রেটারি মনিরুজ্জামান খান সাহেবও একই দলে যাবেন। তাঁর স্ত্রী রানীও সঙ্গী হবেন। রানী আবার পূর্ব পরিচিতা আমাদের। রাজশাহীতে তাঁর আব্বা ইবনে আহমদ সাহেবকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-কর্তারূপে পেয়েছি। তিনি আমার শ্বশুরকূলের প্রতি খুবই সশ্রদ্ধ।

এরপর আরও জানা গেল, আমাদের দলভুক্ত হচ্ছেন আমার শ্যালক মেহরাবের খালু শ্বশুর সাবেক ডিআইজি মামুন সাহেব, খালা এবং তাঁর দুই বোন, এক বোনের মেয়ে কাজল (যিনি প্রত্যক্ষভাবে আমার শিক্ষক, স্বনামধন্য বাংলার অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেবের পুত্রবধূ)। আত্মীয়রূপে আমাদের সঙ্গে এঁদের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক।

দেখতে দেখতে 'আত্মীয়' না হলেও 'স্বজনের' সংখ্যা বাড়তে লাগলো। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক শফিক খান জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের এন্টিবায়োটিক লিমিটেডের প্লান্ট ডাইরেক্টর আতা-এ মওলা একই কাফেলায় শামিল হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় হয়েছে কিনা মনে করতে পারছিলাম না। আজকাল কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিস্মৃতি খুব কার্যকর হচ্ছে। পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো আরাফাতের ময়দানে। ঠিক ময়দানে না, তাঁবুতে। আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি উপস্থিত স্ত্রী ও কন্যা সমেত। কিছুক্ষণ শুভেচ্ছা ও তথ্য বিনিময় হয়েছিল তখন।

আসন্ন হজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। ওদিকে সকাল-বিকাল কর্মক্ষেত্র সাভার যাতায়াত অব্যাহত থাকছে। আমাদের মাইক্রোবাসে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ ড. রশীদুল আলম (নীতিবোধ ও সমতা), অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান (ইংরেজী), ডা. হোসেন রেজা

(ফিজিওলজী), ডা. আবদুল্লাহ (ফরেনসিক মেডিসিন), জনাব কামালউদ্দিন (ফার্মেসী) প্রমুখ সহকর্মী তাঁদের হজব্রত পালনের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা প্রাণবন্ত আলোচনা চালিয়ে গেলেন ক'দিন। সবাই যেন আমার এই মহাযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেমন জানি মনে হল, চলেছি এক মহাপ্রস্থানের পথে। শুরু হচ্ছে আরেক জীবন। সম্পূর্ণ নতুন জীবন। আমি যেন কিছুটা ভারমুক্ত হতে চাই। পারব কি? চেষ্টা করতে দোষ কী? আমার শ্বশুর সৈয়দ আলী আহসানের অনুসরণে আমার তিন পুত্রকন্যাকে এক চিঠি লিখে গেলাম। এটিকে ঠিক উইল বলা যাবে না। এক ধরনের 'ইচ্ছাপত্র' আর কি! সেখানে আমি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ - যা এমন কিছু নয়, স্ত্রীর এবং নিজের অংশের স্বত্ব ত্যাগ করে গেলাম। সেটা স্বামী-স্ত্রী মিলে আমরা দু'জন স্বাক্ষর করলাম ২৪ জানুয়ারি, ২০০৪।

কিন্তু তার আগে ঘটলো আরো কিছু ঘটনা। আগেই বলেছি, আমরা নারিন্দার শাহ্ সাহেবের দলভুক্ত হয়ে হজ করতে গেলেও সমস্ত কর্মকাণ্ডের আয়োজনে ও তত্ত্বাবধানে ছিল পদ্মা ওভারসীজ লিমিটেড। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল আজিজের সঙ্গে ফকিরেরপুল গিয়ে একবার কথাবার্তা বলে এলাম। দু'বার সহকর্মী লিজা শারমিনের মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে আলাপও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সব খরচপত্রের জন্য নির্ধারিত জনপ্রতি ১,২৫,০০০ টাকার পে-অর্ডার ও অন্যান্য কাগজপত্র, অসংখ্য ফটো নারিন্দায় গিয়ে দিয়ে এলাম ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে। এগুলো যিনি গ্রহণ করলেন এবং পরবর্তী বহু দিক-নির্দেশনা যাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল তিনি নিজেই একজন শিক্ষাবিদ, সাবেক অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

জানুয়ারির ২ তারিখ সহকর্মী অধ্যাপক ডা. হোসেন রেজার মাধ্যমে পরিচয় ঘটলো এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের, যিনি রিয়াদে কর্মরত। জানা গেল, তিনি আগের দিনই বেশ কিছু রিয়াল মুদ্রা-ব্যবসায়ীকে দিয়েছেন ভাঙ্গাতে। তবে আরো হাজার-বারোশ' রিয়াল তাঁর কাছে আছে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ঐ রিয়াল আমাকে দিলেন। আমি ১৮,৬০০ টাকার একটি চেক তাঁকে দিলাম।

ইতিমধ্যে আরো কিছু অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। ভেবেছিলাম পকেটমানি রূপে প্রত্যেকে আমরা ২৫,০০০ টাকা করে নেব। কিন্তু দু'বছর আগে বাবার সঙ্গে গিয়ে হজ করে-আসা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.বি.এস.-এ আমার একটি কোর্সের ছাত্রী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরকার ও রাজনীতি' বিভাগের প্রফেসর ড. নাসিম আখতার হোসাইন (সম্প্রতি আমাদের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন 'রাজনীতি ও প্রশাসন' বিভাগ চালু করার উদ্দেশ্যে) আমাকে বললেন, 'স্যার, কিছু টাকা বেশি নিয়ে যাবেন। না লাগলে ফেরত নিয়ে আসবেন, অসুবিধা কী?' ভেবে দেখলাম, খাঁটি কথা। তাই দু'জনের জন্য সর্বমোট ৮০,০০০ টাকা নিলাম। জানিনা, গিন্নীর কাছে অতিরিক্ত কিছু ছিল কিনা। কিন্তু আমি তাঁকে ৪০,০০০ টাকা দিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রীর বান্ধবী শামার কাছ থেকে পাওয়া পূর্বে অব্যবহৃত চামড়ার বেল্ট কোমরে বেঁধে একদিন দিনে-দুপুরে ঘুমিয়ে রিহার্সাল দিলাম। না, কোন অসুবিধা হয়নি। পরবর্তীতে ঐ বেল্ট লাগিয়ে ৩৯ দিন কাটিয়ে দিলাম। তবে শেষের দিকে কিছু বাংলাদেশী টাকা হারিয়ে গেছে কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। বিদেশী মুদ্রা আমার অংশ কিছুই হারায়নি। পুরোটাই খরচ করে ফেলেছিলাম। আমার স্ত্রীর কাছে অল্প কিছু অবশিষ্ট ছিল হয়তো। মোদ্দা কথা, আমরা খুব খুশিমতো খরচপত্র করে মক্কা-মদিনায় সফর সমাপ্ত করতে পেরেছি।

বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে ১৯শে জানুয়ারি আহ্বান পেলাম নারিন্দায় শামিল হতে। হজযাত্রীদের এক জমায়েত হবে সেখানে এবং শাহ্ সাহেব স্বয়ং বক্তব্য উপস্থাপন করবেন। শাহ্ সাহেব মুরাদুল্লাহ-ভাই বাদ-মাগরিব সুন্দর এক ভাষণ দিলেন, হজযাত্রী হিসেবে আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে এবং দোওয়া-মোনাজাত করলেন। বিমানের টিকিট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সহ একটা নতুন জিনিস - সাধারণ পাসপোর্টের বদলে 'পিলগ্রিম পাস' পেলাম।

এবার তাহলে সত্যি সত্যি যেন মক্কা-মদিনার পথে চললাম। এর আগে একদিন বায়তুল মোকাররম গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এলাম।

আমার ছোটভাই নাদির শাহ এগুলো আগেই কিনে ফেলেছে। শুনলাম বাসায় ইহরামের কাপড় পরে 'রিহার্সাল' দিয়েছে। আমরাও গিয়ে দু'জনের জন্য কাপড়, রবারের বালিশ ও অন্যান্য জিনিসপত্র কিনলাম। বেল্টও একটি অতিরিক্ত কিনলাম। সব মিলে ২০০০ টাকাও খরচ হলো না। ভালো, অনেক টাকা পকেটে কিংবা কোমরে থাকায় নিজেকে বেশ বড়লোক মনে হচ্ছে! আসলেই খুব গরিব কি আমরা?

যাহোক, ব্যাপারটা হচ্ছে আসন্ন হজ উপলক্ষে মনে এক ধরনের স্ফূর্তিও জেগে উঠছিল সমস্ত অসুবিধা ও অন্যান্য প্রতিকূলতা ছাপিয়ে।

২২শে জানুয়ারি শেষবারের মতো বর্তমান কর্মস্থল, সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। মার্চের ৬ তারিখ অবধি ছুটি নিয়েছি। হজ যাত্রা উপলক্ষে সবাই শুভেচ্ছা জানালেন এবং তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোওয়া করতে বললেন। আমার কয়েকজন অমুসলমান সহকর্মী - বিশেষ করে ইংরেজির অধ্যাপক টেরেন্স পিনেরো, এনাটমি বিভাগের ডা. বিপ্লব হালদার, উপাচার্যের একান্ত সচিব শ্রীমতী কাজল রেখা সমাদ্দার করুণ কণ্ঠে তাঁদের জন্য দোওয়া করতে বললেন। সবকিছুতেই ভয়ানক অভিভূত হয়ে পড়ছি। ঘন ঘন চোখের কোণে পানি জমে যাচ্ছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। জীবনে বহুবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছি। কিন্তু এরকম তো হয়নি মনের অবস্থা। এ সত্যি এক নতুন অভিজ্ঞতা!

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এসে দেখি, কলকাতায় অবস্থান সংক্ষিপ্ত করে কানাডীয় বন্ধু, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস জোসেফ টি. ও' কনেল ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে আমাদের তৃতীয় তলার খালি এপার্টমেন্টে থাকতে বললাম। তিনি আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। জো আমার খাতিরে আগেভাগে চলে এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য এখনো প্রস্তুত হয়নি।

জোসেফ গত বছরও এসেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের অতিথি-অধ্যাপকরূপে। এর আগের বছরও এসেছিলেন, যখন সৈয়দ আলী আহসান জীবিত। তখন দেখেছি, দু'জনে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত। ২৬শে মার্চ, ২০০২

তারিখে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তৃতাও করেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এর একটা ভিডিও আছে ড. মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের সৌজন্যে।

১৯৭৩ সন থেকে তিনি বাংলাদেশে আসছেন মাঝে মধ্যে। তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। বরিশালে পাদ্রীদের স্কুলে কিছুদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থান করেছেন কিছু সময়। এর মধ্যে তাঁরই আমন্ত্রণে আমি একবার ১৯৮৪ সনে টরেন্টো গিয়েছিলাম বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্সে যোগ দিতে। জোসেফ এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমার বাসায় ছিলেন। এবার আমাদের অবর্তমানেও দিন দশেক ছিলেন। পরিবারের সকল সদস্যদের সঙ্গে অত্যন্ত আপন হয়ে পড়েছেন। আমার নাতি রা'দ (৩+) ও নাতনি প্রমা (১.৬+) ও তাঁকে 'ছোটবন্ধু' বা 'কলেজ বন্ধু' রূপে সম্বোধন করে। যদিও জোসেফ দৈর্ঘ্য ৬ ফুট আর প্রস্থ কিংবা ওজনও তদনুরূপ। আমার দুই কাজের ছেলে সোহেল এবং রুবেলও আমাকে যেমন নানা ডাকে, তেমনি প্রফেসর ও' কনেল-কেও 'জো-নানা' বলে ডাকে। এগুলো অবশ্য আমি হজ সেরে এসে প্রত্যক্ষ করলাম। আমার মেয়ে প্রসন্না (নুসরাত কমর), ওর স্বামী জুয়েল (মহসীন হাবিব চৌধুরী), বড় ছেলে পুষণ (নাবিল শাহ), তার স্ত্রী রুম্পা (ফারহানা শারমিন), ছোট ছেলে পাপ্পু (শাজেল শাহ) ও ওর স্ত্রী চিত্রা (সাদিয়া ফারজানা)ও জোসেফকে একান্ত আপনজনের মত গ্রহণ করেছে। জোসেফ বৈষ্ণব গবেষণায় চল্লিশ বছরের ওপর কাটিয়েছেন।

এক সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংকট নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। বাংলা ভালো লিখতে ও বলতে পারেন তিনি। দুই বাংলার বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর খাতির রয়েছে। এঁদের মধ্যে আমিই বরং সীমিত পরিচিতির লোক। তবে সৌভাগ্যবশতঃ জোসেফের কাছে অন্তত আমার কিছুটা দাম আছে। তার কারণ হচ্ছে, ফরাশি ভাষায় লেখা 'বাঙালি মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ' সম্পর্কে আমার অভিসন্দর্ভ ও অন্যান্য রচনা। এতে আমাদের দু'জনের সৌহার্দ্য প্রলম্বিত ও প্রসারিত হয়েছে।

২৪শে জানুয়ারি সকালে জোসেফকে নিয়ে ধানমন্ডিস্থ ৬ নম্বর সড়কে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নগর হাসপাতালে গেলাম। সেখানকার কর্তাব্যক্তি ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমরা গিয়ে দেখি একটু আগে তিনি কলকাতার পথে বিমান বন্দরে চলে গেছেন। আমরা ক্যান্টিনে গেলাম চা পান এবং একটু আড্ডা দেবার জন্য। পেয়ে গেলাম ডা. এস. এ. হাফিজ ও ডা. মোহাম্মদ ফরিদ আহমদ-কে। তাঁদের সঙ্গে জোসেফ-এর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম। ডা. ফরিদ হলেন এককালের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস মাখনের ছোট ভাই। তাঁর কন্যা টরেন্টো শহরে পড়তে যাবেন। সুতরাং তাঁর একটু বিশেষ আগ্রহ আছে জোসেফ-এর সঙ্গে আলোচনায়। সাত মসজিদ রোড ও মিরপুর রোডে কিছু কাজ ছিল। কিন্তু হলো না। বাসায় ফিরে কয়েকটি চিঠি লিখলাম। আসলে জবাব দিলাম। বেশ কিছুদিন পরে ফরাশি বন্ধু লুসিয়ঁ বিগো, কলকাতার শুভাকাঙ্ক্ষী ড. ভবতারন দত্ত প্রমুখকে চিঠি লিখতে পারলাম। কনিষ্ঠ পুত্র পাপ্পু (আলকাটেল কোম্পানিতে কর্মরত) ও তার স্ত্রী চিত্রা (প্রাইমেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত) পোস্ট করবে, কুরিয়ার সার্ভিসে দিবে কিংবা ই-মেইল করবে। যাক, নিশ্চিন্ত!

যাত্রা হল শুরু

রাত সোয়া ১২টায় দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে ইহ্‌রাম বাঁধলাম। অর্থাৎ যথার্থভাবে মহাপ্রস্থানের পথে রওনা দিচ্ছি দু'খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় জড়িয়ে। কোমরে চামড়ার বেল্ট, বুকে একটা কাপড়ের বিশেষ থলে - জরুরি কাগজপত্র সহ।

জীবনে এই প্রথম এ ধরনের পোশাক পরিধান।

কথাটা ঠিক বললাম না। ১৯৭৭ সনে জেদ্দায় এর আগে একবার ইহরাম পরেছিলাম। ইনতু চাচা ওরফে রশিদুর রহিম সাহেবের বাসায়, চাচা-শ্বশুর ড. সৈয়দ আলী আশরাফ সাহেবের নির্দেশে। মক্কার পথে রওনা দেবার পূর্বাহ্নে ঐ পোশাকটি অঙ্গে ধারণ করেছিলাম। কিন্তু তখন এ ধরনের অনুভূতি সম্ভবত হয়নি। বয়সও কম ছিল। তাছাড়া তখন ইউরোপে সাড়ে তিন মাসের অত্যন্ত সফল এক সফর শেষে দেশে ফেরার পথে ছিলাম সেখানে।

যাহোক, এখানে ইহরাম বাঁধবার অভিজ্ঞতার বিবরণ অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান যা লিখেছেন, তার থেকে একটু উদ্ধৃত করি :

'দুটুকরো কাপড় - একটি পরিধানের জন্য, একটি গায়ে জড়ানোর জন্য। শুভ্র এ দুটি বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে একজন মানুষ সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়। সংসারের চিন্তা সে আর করতে পারে না। পার্থিব কোনো ইচ্ছা তাকে আকুল করতে পারে না। সেলাই ছাড়া শুভ্র একটি বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে এবং একখণ্ড গায়ে দিয়ে একজন মানুষ কাফনের পোশাক পরে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়। নানাবিধ নিয়ম আছে। সে নিয়ম সকলেই পালন করবার চেষ্টা করে।'

এক অদ্ভুত অনুভূতি! নীচে নেমে আসতেই জোসেফ অভ্যর্থনা জানাল : 'ভালোই মানিয়েছে ফিউচার হাজীকে! আমি কি একটা ছবি তুলতে পারি?'

'অবশ্যই।' - জোসেফ কয়েকটি ছবি তুললেন আমার ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে।

মনে একটা ভয় ছিল এত রাত্রে বিমান বন্দরের পথে যেতে। সন্ত্রাসী-ডাকাতের তো কমতি নেই বাংলাদেশে। ছোট বোন বুলবুলও গ্রীন রোডে বসবাসরত আমাদের মধ্যে চতুর্থ ভ্রাতা আকবর শাহ কোরেশী (কেনু)-র বাসা থেকে ওর বড় ছেলে আরিফসহ রওনা দিচ্ছে। বনানী থেকে হজযাত্রী পঞ্চম ভ্রাতা নাদির শাহ (আমরা সর্বমোট ছয় ভাই। আল্লাহর অনুগ্রহে সবাই জীবিত। দু'ভাই শৈশবে বিদায় নিয়েছে) রওনা দিয়েছে। যাক, সবাই সহি সালামতে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু বোর্ডিং পাস নিতে গিয়ে শুরু হলো নানা ঝুট-ঝামেলা। নানাজন নানা দিক থেকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে কর্মরত বিমান কর্মী ও কর্মকর্তাদেরকে। সহকর্মী কামাল বলেছিলেন, 'চেহারা দেখে ভালো ব্যবস্থা করবে ওরা'। কারণ হজ ফ্লাইটে সব 'ফ্রি সিটিং'। তাহলে দয়া করে 'জে' ক্লাসে কি বসানো যায় আমাদের? বদভ্যাস হয়ে গেছে আমার। গত দু'দশকের বেশি সময় ধরে প্রায় সব আন্তর্জাতিক ভ্রমণে এক্সিকিউটিভ তথা 'জে' ক্লাসে, এমনকি প্রথম শ্রেণীতেও ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি। পরের ধনে পোদ্দারি আর কি!

ভাগ্নে আরিফও কিছু প্রভাব খাটাবার প্রয়াস পেল তার কোন বন্ধুর মারফত। কিন্তু যা' হবার তাই হলো। অর্থাৎ 'জে' ক্লাসে নয়, 'জে' সারিতে বেশ অসুবিধাজনক অবস্থানে বোডিং পাস মিললো। তবে একটা সুবিধা হলো, মোটামুটি পাশাপাশি বসার জায়গা হলো আমাদের পরিবারের চার বান্দার। একপাশে নাদির আর আমি, করিডোরের পর জানালার পাশে বসলো বুলবুল আর নাসরীন।

অবশ্য প্লেনে ওঠার আগে বিমান বন্দরের মসজিদে আমরা নারিন্দার শাহ সাহেব মুরাদুল্লাহ-ভাইয়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে গেলাম এবং হজের নিয়ত করলাম। তিনি এসে পড়েছিলেন রাত একটার একটু পরেই। চমৎকার সৌজন্যভরা তাঁর ব্যবহার। মনে দাগ কাটে।

বিমান ঠিক ৪-৪৫ মিনিটে ছাড়ল। যেমনটি টিকিটে লেখা ছিল। চমৎকার উড্ডয়ন। আমাদের অংশে একটা ছেলে ৪ জন করে যাত্রীর সারিকে, অন্য পাশে একজন বিমানবালা ও একজন পুরুষ ৫ জনের সারিকে আপ্যায়ন করে চলেছেন। ছেলেটাকে শেষমেষ না বলে

পারলাম না, 'ভাই, আপনি একাই একশ! চমৎকার সার্ভিস!' ক্যাপ্টেন লুৎফর ও তাঁর ক্রুরা সুন্দর টিমওয়ার্ক করে গেছেন। তাও আবার মাইক ছিল খারাপ। নাশতা, লাঞ্চও খুব একটা উন্নতমানের ছিল না।

কোন যানবাহনে উঠবার আগে যেমন বিমানে আরোহণের পূর্বে যে কথা প্রত্যেকের উচ্চারণ করতে হয় অথবা উচ্চারণ করা কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, তা হল : 'মহান আল্লাহ এমন এক মহান সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যাঁর সাহায্য ছাড়া এই বাহনকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা সকলেই সেই মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো।'

আমি অবশ্য বিমানে আরোহণের পরে এই দোওয়া পড়েছিলাম। পরবর্তী বিভিন্ন সময়েও সম্ভব হলে সৈয়দ আলী আহসানের *হে প্রভু আমি উপস্থিত* শীর্ষক ক্ষুদ্র কিন্তু মহামূল্যবান গ্রন্থটি থেকে পড়বার চেষ্টা করেছি এবং সে উপলক্ষে সবসময় সঙ্গে রেখেছি। আমার এই ক্ষুদ্র রচনায় সেই বইটি থেকে কখনো কখনো উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

দিনলিপি

২৫ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১২ মাঘ, ১৪১০ ● ৩ জিলহজ, ১৪২৪

ডিসি-১০ বিমান যথাসময়ে অর্থাৎ ১-২৫ মিনিটে খুবই মোলায়েমভাবে সৌদী আরবের ভূমি স্পর্শ করল। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী! আমরা অবতরণ করলাম জেদ্দা বিমান বন্দরের হজ টারমিনালে।

জেদ্দায় পৌঁছে যে দোওয়া করতে হয়, তা নিম্নরূপ :

'হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট এই শহরের অভ্যন্তরস্থ অমঙ্গল থেকে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! যেখানে প্রবেশ করা শুভ এবং মঙ্গলজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যে স্থানে অবস্থান অশুভ ও অমঙ্গলজনক সেখান থেকে তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে আস এবং তোমার উৎস থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো।'

এই শহরটি এক ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বন্দর নগরী। ১৯৭৭ সনে আমি কিছুটা ঘুরেছি এতে। কিন্তু তখন চারদিকে চলছিলো ভাঙ্গার গান। চোখের সামনে দশ তলা পুরনো দালানও ধ্বংস করা হচ্ছিলো। এবার এর অভ্যন্তরে যাবার সুযোগ আমার ঘটেনি। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম জেদ্দার আন্তর্জাতিক হজ টারমিনাল।

হজ টারমিনাল দেখে বিস্মিত হতে হয়। এটা অন্য কোন টারমিনালের মতো নয়। আমাদের গর্ব, স্থপতি এফ. আর. খানের কীর্তি। আমার সহপাঠী আমেরিকাবাসী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খানের বড় ভাই, আমার শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে একটু আত্মীয়তাও আছে তাঁদের। তাঁবুর পর তাঁবুর কংক্রিট চাঁদোয়া দেওয়া প্রায়-উন্মুক্ত হজ টারমিনাল নবাগতদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তখন সবারই লক্ষ্য হচ্ছে কীভাবে কত তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে বাইরে আসা যাবে। আর সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! মনে হয়, ওখানকার লোকজন বেশির ভাগই আনাড়ি। এক জায়গায় সবাইকে একটা করে হজ সংক্রান্ত ছোট্ট বাংলা বই উপহার দিচ্ছে একটা লোক। আমি সামনে এলে বললো, 'ওহ, ইউ রিড ইংলিশ?' এই বলে আমাকে দুটো বই দিলো। আমি সেগুলি গ্রহণ করলাম এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। এক জায়গায় এসে কিছুক্ষণ বসতে হলো। যাক, বহু ঘোরপ্যাঁচের পর বেরিয়ে এলাম বাংলাদেশ হজ মিশনের জন্য নির্ধারিত এলাকায়। বেশ বড়সড় চত্বর। তবে পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে। মক্কা যাবার বাসের অপেক্ষায় প্রায় আট ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। ইত্যবসরে আশেপাশে কিছু বিপণী বিতান ঘুরে এলাম। এক পর্যায়ে নারিন্দার হুজুর আমাদের জন্য চমৎকার চিকেন ব্রোস্ট আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই - ফাস্ট ফুড খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আশেপাশে অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। বিমানে সে সুযোগ ছিল না। কে কোথায় বসেছিলেন কে জানে! আদৌ যে এসেছিলেন, সে খোঁজ করাও সম্ভব হয়নি শেষ রজনীর যাত্রায়। প্রথমে দেখা আমাদের বহু দিনের পুরনো আত্মীয় ডিআইজি মামুন সাহেব, খালা ও তাঁর দুই বোন, সঙ্গে তাঁদের একজনের কন্যা কাজল, ফারুক ভাই (সরকারের অতিরিক্ত সচিব মনিরুজ্জামান খান) ও তাঁর স্ত্রী রানী (সৈয়দা মমতাজ বেগম)। আর অন্য গ্রুপের মাধ্যমে আসা সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. শমসের আলী ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাস ছাড়ল কিন্তু পথ যেন ফুরোয় না। রাস্তা তো মাত্র ৮০ মাইলের। ১৯৭৭ সনে আমি, আশির দশকের শেষ দিকে সৈয়দ আলী আহসান ঘণ্টা-দেড়ঘণ্টায় এই পথ পরিক্রমা শেষ করেছিলাম। তবে এখন পথে ও শহরের প্রান্তে বহু বিস্ময় - ছাব্বিশ বছর আগে দেখা মক্কা আর নেই। চারদিকে অদ্ভুত আলোর বন্যা জ্বলজ্বল করছে সুন্দর দালানকোঠার ওপর। রাস্তায় অজস্র লোক, নানা দেশের নানান বেশের। আমাদের লুঙ্গি-চাদর পরিহিতও আছেন। চমৎকার এক মসজিদ চত্বরে বাস থামলো নামাজের জন্য। ইশার নামাজ পড়ে নিলাম। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়লাম বহু কাঙ্ক্ষিত আল-মক্কাহ্ আল-মুকারম্মাহ'র সীমানায়। এখানে স্মরণযোগ্য, এ সময়ের উপযুক্ত প্রার্থনা :

'হে আমার প্রভু, আমি তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি। তুমি মহান বিশ্বপালক, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও এবং এই নগরীর পবিত্রতায় আমাকে আচ্ছন্ন করো।'

অনেক রাত করে সামান্য পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে উঠে গেলাম আমাদের জন্য ভাড়া করা বাড়িতে। নির্ধারিত কক্ষে অবস্থান নেওয়ার পক্ষে অনেক অসুবিধা ছিল। শেষ পর্যন্ত শোরগোল মিটল। বয়স ও অসুস্থতার বিবেচনায় গোলাম রব্বানী, ফারুক ওরফে মনিরুজ্জামান খান ও আমাকে নিচের প্রথম কক্ষ দেওয়া হয়েছে। পাশের কামরায় আমার স্ত্রী ও বোন রয়েছে। তাই আমার ভাই নাদিরকে আমাদের কক্ষে রাখা হলো। মোট চারজনের কামরা। ছোট লোহার খাট, ফোমের বিছানা ও লেপ। পাশে বড় বাথরুম কমোড ও গরম পানি সমেত। মাঝারি করিডোরের বিপরীতে আরেকটি বাথরুম, যাতে রয়েছে ঠাণ্ডা পানি ও দেশীয় টয়লেট। থাকা-খাওয়ার অবস্থা মোটামুটি ভালোই বলতে হবে। অনেকটা অপ্রত্যাশিত।

২৬ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৩ মাঘ, ১৪১০ ● ৪ জিলহজ, ১৪২৪

আমরা রয়েছি আজিয়াদে রোডে, মেরিডিয়ান ও টাওয়ার হোটেলের কাছে। ২৬শে জানুয়ারি মক্কায় আমাদের প্রথম দিন। সকাল ১০টার দিকে কাবা অভিমুখে যাত্রা শুরু করবো ঠিক হয়েছে।

প্রথম উমরাহ্ পালন

কাবা প্রদক্ষিণ তথা তাওয়াফ করতে বহু বিপত্তির সম্মুখীন আমরা। এক পর্যায়ে দেখা গেল সঙ্গে নাদির নেই। বোন বুলবুলের সঙ্গে ছিল। পরে বুলবুল নাসরিনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ওকে খুঁজতে গিয়ে আমি নিজেই দল হারিয়ে ফেললাম। যাহোক, আরো কষ্টসাধ্য সাফা-মারওয়া সায়ী সমাপ্ত করলাম। সাত বার এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া। প্রায় পাঁচ মাইল হাঁটা, দৌড়ানো। অবশ্য যদ্দূর পারা যায় নির্ধারিত দোওয়া-দরূদ পাঠ করতে করতে চলেছে এই পরিক্রমা। প্রচণ্ড ভিড়। যাহোক, জমজমের পানি-পান ক্লান্তি অনেকটা কমিয়ে দিল। মনে হল, মক্কায় এখন যেন সত্যিকার বসন্ত। চমৎকার আবহাওয়া। মক্কার চেহারাই অন্যরকম!

আমি তো ছাব্বিশ বছর আগে দেখেছি মক্কা শরীফকে। স্বল্পকালীন অবস্থান - তিন কি চার রাত ছিলাম, ভালো লেগেছিল। নভেম্বরের একটি শুক্রবারও পেয়েছিলাম। কিন্তু এতো হাজার হাজার বছরের পুরনো শহর। ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে ইতিহাসের অনন্য অবস্থান মক্কাহ্ আল মুকারাম্মাহ-র পবিত্র নগরী। হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর ছেলে ইসমাইল (তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক), তাঁদের অনুপম অবস্থানকালে আল্লাহর ঘর নির্মাণের পর আজ অবধি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ তাকে প্রদক্ষিণ করতে আসে। মহাপ্রভু শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি, গাছপালা - সবকিছুর জন্য এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান রেখেছেন। এখানে কেউ ভালো কাজ করলে তার পুণ্য যেমন বেশি হয়, তেমনি মন্দ কর্মে লিপ্ত হলে পাপও হবে অধিক। রসুলে খোদা (সা.) একে আল্লাহর সবচে' প্রিয় ভূমিরূপে চিহ্নিত করেছেন।

এই পবিত্র নগরীকে আল্লাহ নিজেই পাঁচটি নামে অভিহিত করেছেন :

মক্কাহ, বাক্কাহ্, আল-বালাদ, আল-কারিয়া এবং উম্মুল-কুরা।

এছাড়াও প্রায় পঞ্চাশটি নামে অনেকে মক্কার গুণকীর্তন করে গেছেন। যেমন : আল-নাস্‌সাসাহ্, আল হাতিমাহ, আল-হারাম, সালাহ, আল-বাসাহ্, মু'য়াদ, আর-রা'স, আল-আমিন, কাও'আ প্রভৃতি।

ছাব্বিশ বছর আগে আমার চাচা শ্বশুর অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের সঙ্গে জেদ্দা থেকে একটি মাইক্রোবাসে বাদ-জোহর মক্কা শরীফে এসে পড়েছিলাম। খুব দ্রুত এসেছিলাম মনে পড়ে। ভয়ানক এক মানসিক পরিস্থিতি সে সময়ে কার্যকর ছিল। যেন একটা বড় ধরনের অসম্ভব সম্ভব হতে যাচ্ছে। তবে মক্কার পুরনো পরিবেশ আমার কাছে খুব আন্তরিক মনে হয়েছিল। স্বল্প সময়ে আমি আত্মস্থ হতে পেরেছিলাম। মনে হচ্ছিলো আমি যেন এখানে বহুদিন ধরে আছি। চাচা শ্বশুর আমাকে কাবা শরীফের চারপাশে তাওয়াফ করালেন, নামাজ পড়ালেন এবং একবার 'সায়ী' করে মারওয়ার পর্বত শৃঙ্গে (টিলার নীচে) বসে পড়লেন। আমাকে অবশিষ্ট ছ'বার দোওয়া-দরুদ পড়তে পড়তে ঘুরে আসতে বললেন। পরে বাসায় গিয়ে নিজেই কাঁচি

দিয়ে আমার চুলের পেছন দিকের কিছু অংশ কেটে দিলেন। সেখানে তাঁর পিতৃ ও মাতৃকূলের দু'দিক থেকে 'ফার্স্ট কাজিন' অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। স্নিগ্ধ সমাদরে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। সে সময়ে ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত (১৯৭৭) ফরাশি ভাষায় রচিত আমার 'বাংলা মরমী কবিতা' শীর্ষক বইখানি তিনি যত্ন করে আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন বা পাঠের চেষ্টা করলেন। কারণ তাঁর ফরাশি জ্ঞান খুব গভীর ছিল না। সেজন্য তাঁর মনে একটু ক্ষোভও ছিল। কেননা ইংরেজি অনুবাদে তিনি ছিলেন ফরাশি সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক। বিশেষ করে মার্সেল প্রুস্ত ছিল তাঁর অতি প্রিয় লেখক। তাছাড়া, তাঁর অপূর্ব রান্না খেয়েছি সে ক'দিন।

দুই চাচার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে এদিক-ওদিক গিয়েছি। বিশেষ করে আশরাফ চাচার সঙ্গে তাঁদের এক আরব ডীনের বাসায় ঘণ্টাখানেক কাটানোর অভিজ্ঞতা এখনো স্মরণে আছে। এক ধর্মগুরুর ঢেরায়ও তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ...

যাহোক, এবারের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। এখন আছে বয়সের চাপ, আছে একটা পবিত্র কর্তব্য সমাপনের প্রাক্কালে এক ধরনের মানসিক উদ্বেগ। আমি কি আমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে পারছি বা পারবো? 'লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' হচ্ছে এ মুহূর্তে প্রধান 'লিটানি' (সম্মিলিত উচ্চারণ মন্ত্র)। মনে পড়লো পাকিস্তানী কাওয়াল (সাবরি ব্রাদার্স)-এর অসাধারণ গান 'লাব্বায়েক'! আশির দশকের প্রথম দিকে শোনা। দূর-অতীতের সেই সুর এখন আমাকে নতুনভাবে উন্মনা করে তুলছে। তবে আপাতত মুরাদুল্লাহ-ভাইয়ের সুললিত কণ্ঠ আর কখনো সেই কণ্ঠ পারিপার্শ্বিকতার কারণে চাপা পড়ে গেলে প্রখ্যাত চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের উদাত্ত কণ্ঠে 'লাব্বায়েক' পূর্ণাঙ্গভাবে উচ্চারিত হচ্ছে আর আমাদের ৬৬ জন বাকী সহযাত্রীদের পরিচালিত করছে পুণ্যপথে :

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক
লাব্বায়েক লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নেয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলুক্
লা শরীকা লাকা।

প্রথম ওমরাহর পর বেরিয়ে আমার স্ত্রী ও বোন বুলবুলকে পেলাম। তখন ক্লান্তি, শ্রান্তি ও মানসিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তাদের একটি জায়গায় বসিয়ে সামনের চুল কাটার দোকানে ঢুকলাম। পাঁচ রিয়ালে ট্রিম করা আর দশ রিয়ালে ন্যাড়া হওয়ার 'অপমান' আছে। প্রথমটাই গ্রহণ করলাম। হায়রে! সামনের আয়নায় যাকে দেখি সে লোকটাকে দেখে মনে হলো না যে আমি! তিরাশি সাল থেকে চুলে কলপ লাগাতে বাধ্য হচ্ছি। সে অনেক ইতিহাস! আমি বা আমার স্ত্রী এ কাজে আসলে ইচ্ছুক ছিলাম না অথচ তা ঘটে গেল। বিশ বছর যাবৎ এই অস্বাস্থ্যকর কাণ্ডটায় নিজেই সায় দিয়ে গেছি।

চুল শাদা হবার আগেই কালো রঙ পড়েছে। তবু মনে মনে একটা ধারণা ছিল যে, ষাট ভাগ না হোক অন্তত চল্লিশ ভাগ চুল বোধহয় কালোই আছে। কিন্তু আমার সামনে সে সময়ে আয়নায় যার প্রতিচ্ছবি দেখলাম তার একটি চুলও কালো নয়, সবই শাদা।

চারপাশে লক্ষ জনতা, উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে বোন বুলবুলকে নিয়ে আপাতত লক্ষ্য হলো আইসক্রিম খেয়ে জিহ্বার শান্তি আনয়ন। তবে বোঝা গেল, প্রথম উমরাহ্‌র প্রভাবে সবাই আমরা এক ধর্মীয় চেতনায় বিভোর হয়ে পড়েছি। হারাম শরীফের সামনের দিকে একটা টানেল পর্যন্ত অনেক দোকানপাটের সারি। খবর পেয়েছিলাম, ওখানে খবরের কাগজ কিনতে পারব। দু'দিন যাবৎ সংবাদপত্রহীন রয়েছি। এক দুঃসহ পরিস্থিতি! কিন্তু বইপত্রের কোন দোকান পেলাম না। সব কাপড়-চোপড় ও বিভিন্ন মনোহারী দ্রব্যের। অবশেষে একটা বইয়ের দোকান পেলাম। কিন্তু সেখানে কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কিত অনেক আরবী ও কয়েকটি ইংরেজি গ্রন্থ, দৈনিক ও সাময়িক পত্র নেই।

বুলবুল, নাসরীন ও আমি আধুনিক দোকানপাট থেকে অবাক হয়ে পড়ছিলাম। বহু কষ্টে, ভিড় ঠেলে আইসক্রিম খেলাম। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমার অতি প্রিয় গাঢ় লাল রঙের উলের টুপিটি নেই। নেই তো নেই। অন্য কোথাও নেই। কখন কোথায় পড়ে গেছে বুঝতে পারিনি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে হল কাবা শরীফের কোথায়ও যেন 'হারানো প্রাপ্তি কর্ণার' দেখেছিলাম। কিন্তু সেদিকে ফেরাও খুব কঠিন ব্যাপার। হায়রে, এই টুপি মাথায় ১৯৯১ সালে

মার্কিন মুল্লুক, ১৯৯২ সালে ফ্রান্স সহ আরো কতো দেশ-বিদেশ ঘুরেছি। বহু ছবিতে এটি আমার শিরদেশে শোভা পাচ্ছে। আর বহু বন্ধুবান্ধব টুপিটির খুব প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ পেতে চাইতেন। কোত্থেকে পেয়েছিলাম এটা মনে পড়ে না। আমার শ্যালক মেহরাব কি আমাকে এটি দিয়েছিল? যাহোক, এখন আর নেই। আর একটা আফসোসের বিষয়। আমার স্ত্রীর হাত থেকে একটা দামি জায়নামাজ (যা আসলে আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর) কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। খেয়াল করা গেল না।

প্রচণ্ড ভিড় অতিক্রম করে আমাদের বাসস্থানে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ। আমাদের জন্য সীম ভর্তা, মুরগির ঝোল (মাংস সমেত), ডাল, ভাত অপেক্ষা করছে। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। সামান্য একটু ঘুম। উঠে চা কিনে খেলাম। একটু পর নাদির শাহ ও ফারুক ভাই এলেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে আরেক কাপ চা পাওয়া গেল। ঠিক করেছি, সন্ধ্যা অবধি আমি আর বেরুচ্ছি না। শরীর ভীষণ ক্লান্ত। মহিলারা আছরের জন্য বেরিয়েছেন আর ফেরেননি।

২৭ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৪ মাঘ, ১৪১০ ● ৫ জিলহজ, ১৪২৪

শরীরটা একটু খারাপ। খুব ভোরে উঠে করিডরে নামাজ পড়লাম। তারপর আবার একটু শুয়ে থাকলাম। পরে নাশতা এলো। হালুয়া রুটি। প্রতি বেলায় কিছু নতুন নতুন খাবার দেবার প্রয়াস। ভালো লাগল। তবে অনেকে পছন্দ করলো না মনে হলো। ফারুক ভাইয়ের এক আত্মীয় জেদ্দা থেকে এসে অনেক ফলোপহার রেখে গেছেন - স্ট্রবেরি, আঙুর আর কমলা। আমার স্ত্রী নাসরীন ওর প্রিয় ফল পীচ এবং এপ্রিকট নিয়ে ফিরল। আমি বেরুচ্ছি দেখে আমার সঙ্গে আবার বেরুল। আমরা উঁচু থেকে নেমে বাঁদিকে ৩/৪ মিনিট হাঁটলেই হারাম (কাবা) শরীফের চত্বরে চলে আসি। তাই এবার ডান দিকে নতুন কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম। চমৎকার সড়ক। সকাল সাড়ে ৯টা। একটু হিমেল বাতাস বইছে। দু'জনে স্যান্ডুইচ খেলাম গরুর গোশত ও সালাদ দিয়ে তৈরি। এক একটি মাত্র দু'রিয়াল। এই

স্যান্ডুইচ-এর অপর নাম শর্মা। কফি - তাও দু'রিয়াল। আশেপাশের দোকানদারদের সঙ্গে একটু আলাপ জমালাম। সাতকানিয়া, বেগমবাজার, চৌদ্দগ্রাম, মুন্সীগঞ্জের যুবকদের পেলাম। স্বদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে তারা পুলক অনুভব করছে মনে হলো। আমরা তো বটেই!

ঘরে ফিরে নাসরীন গোসল করে নিলো। তারপর বুলবুল সহ আমরা কাবা মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। নাদির শাহ চলে গেছে আগে। অন্যরাও। ওরে বাপরে, কী ভিড়! এক নম্বর গেট তথা কিং আব্দুল আজিজ শাহী দরজা দিয়ে প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা গেটের বাইরে, সিঁড়ির ধাপ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে জোহরের নামাজের জন্য বসে পড়লাম। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ। আমার ডান দিক, বাঁদিক কিংবা মাথার ওপর দিয়ে বহু ভিনদেশী নারী-পুরুষ পার হয়ে যেতে থাকল। অথচ সামনে কোথায়ও বসার বা দাঁড়ানোর জায়গা দেখা যায় না। এর মধ্যেও কেউ কেউ জায়গা করে নিয়েছে। পাশে ছিলেন এক মাঝবয়সী ইন্দোনেশিয়। হঠাৎ তিনি উঠে গেলেন, সামনে কারো কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে। সেখানে বসলেন এক পাকিস্তানী। বয়স্ক লোক। এসেছেন লাহোর থেকে। একটু আলাপ-সালাপ হলো উর্দুতে। জোহর ও জানাজা পড়ে রওনা দিলাম। উল্লেখ্য, প্রায় প্রতি বেলায় এখানে ফরজ নামাজের পর জানাজার নামাজের আহ্বান আসে।

২৮ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৫ মাঘ, ১৪১০ ● ৬ জিলহজ, ১৪২৪

আজ সকালে যখন করিডরে দাঁড়িয়ে ফজরের নামাজ পড়ছিলাম তখন দেখি মুরাদুল্লাহ-ভাই সদলবলে ফিরে আসছেন। সালাম বিনিময় হলো। খবর পাওয়া গেল, আগামীকাল রাত আড়াইটায় আমাদের মিনায় রওনা দিতে হবে। সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে খাবারের জন্য আমাদের ১০০ রিয়াল ফেরত দেওয়া হচ্ছে। এদিকে কোরবানীর জন্য অগ্রিম ২৪০-রিয়াল দিতে হবে। দেনা-পাওনার বিষয় অল্পক্ষণেই মিটে গেল।

সন্ধ্যায় আমার পুত্রবধূ সাদিয়া ফারজানা চিত্রা-র মামা জাহিদ সাহেব এলেন সস্ত্রীক। চিত্রারা টাঙ্গাইলের হলে কী হবে, জাহিদ সাহেব চট্টগ্রামের। তিনি মাইজভাণ্ডার পরিবারের লোক। তবে আধুনিকমনা রসায়নবিদ। চিত্রারা একসময় পাশাপাশি জেদ্দায় ছিল। জাহিদ এখনও সেখানে কর্মরত। বেশকিছু কমলা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে চট্টগ্রামে থাকেন। আপাতত মায়ের সঙ্গে হজ করবেন বলে এখন মক্কা শরীফে রয়েছেন।

আমার স্ত্রী ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে একটু অস্থির হয়ে রইলো। চট্টগ্রাম থেকে হজের জন্য আগত আমার আরেক ছোটভাই জহির শাহ (খোকন) ও তার স্ত্রী সুলতানাকেও ফোন করে পাওয়া গেল না। ওরা আমাদের অনেক আগে এসেছে। মদিনা হয়ে এখন মক্কায় আছে। ওরা থাকছে রসুলে খোদার (সা.) পৈতৃক নিবাসের কাছাকাছি এক বাড়িতে।

শরীর বেশ একটু নাজুক। কিন্তু আরামে আর স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে।

সারা দিন শুয়ে-বসে, হজে করণীয় বিষয়ে বই পড়ে কিংবা গল্পগুজব করে কাটালাম। চমৎকার অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। কামরা ছোট কিন্তু ব্যবস্থা হয়েছে ভালো। আমার ডানে এক ফুটের কম দূরত্বে ছোটভাই নাদির শাহ। একই দূরত্বে ওর ডান পাশে গোলাম রব্বানী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক কিন্তু মোটর টায়ারের বড় ব্যবসা চট্টগ্রামে। পঞ্চাশ বছর ধরে প্রধানত বন্দরনগরীতেই থাকেন। তবে তাঁর স্ত্রী ঢাকার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে পড়াতেন। আমার ছাত্র ড. সরদার আবদুস সাত্তারের স্ত্রী শাহীনকে তিনি চেনেন। শাহীন হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তাদের ছেলেমেয়ে উদয় আর পৌষালীকে ঐ স্কুলে নিয়ে যেত। রব্বানী সাহেব আমাদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমরা অবশ্য সুযোগ পেলে তাঁকে নিয়ে এর মধ্যে একটু হাসি-ঠাট্টাও করি। তাঁর বিপরীতে অবস্থান আমাদের ফুপাতো ভাই এবং মান্যগণ্য সরকারী কর্মকর্তা ফারুক ভাই ওরফে মনিরুজ্জামান খান। তাঁর সামনে একটা ছোট টেবিল যেন একটু সম্মান প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু আসলে সেখানে

রয়েছে খাবার পানি, ফলমূল, বাসন-পেয়ালা। কে কোথায় শোবেন সে ব্যবস্থা আমিই করে দিয়েছিলাম এবং সবাই তা মেনে নিয়েছেন।

রাতে খাবার শেষ করে আমাদের তিন মহিলার সাথে বের হলাম। একেবারে ইনফরমাল পোশাকে অর্থাৎ লুঙ্গি, কোর্তা আর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে। বাইরে চমৎকার আবহাওয়া - যাকে বলে 'মাতাল সমীরণ'! সমস্ত রাস্তাজুড়ে, হারাম শরীফের সামনের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে অগুনতি মানুষ। নারী, পুরুষ, শিশু অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে 'প্রমনাদ' করছে অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা ঘরে ফিরছে। কেউ রাস্তার দু'পাশের দোকান কিংবা চাদর বিছিয়ে বিক্রির জন্য সওদা নিয়ে-বসা আফ্রিকার হাবসী মহিলাদের সঙ্গে দরদাম করছে। আলোর বন্যায় মক্কা যেন ভাসছে। হাসিখুশি তীর্থযাত্রীদের গমনাগমন দেখে প্যারিসের চৌদ্দই জুলাই কিংবা লন্ডন-নিউইয়র্কের বড়দিনের মধ্যরাত্রির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে এখানে কোন মদ্যপ, উচ্ছৃংখল যুবক-যুবতী নেই। একসঙ্গে শতাধিক দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় তরুণী হয়তো স্মিতহাস্যে পথ পরিক্রমা করছে। হজ সেরে দেশে ফিরে ওরা হয়তো বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে সংসারজীবন-যাপন করবে। পাশ্চাত্যের মতো মেয়েদের পোশাক হাঁটুর ওপরে নয় বরং পায়ের গোড়ালি অবধি। কোথাও কোন বাড়াবাড়ি নেই। অধিকাংশই কালো পোশাক ও হিজাবসহ। তাতে ফর্সা, কালো, বাদামী মেয়েদের চেহারা যেন আরো খোলতাই হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার অপরূপ সৃষ্টি!

হারাম শরীফের বিপরীত দিকে কিছুদূর এগুলেই মিসফালাহ। এই এলাকায় অনেক স্বদেশী রয়েছেন বলে জানা গেল। ঢাকা/চট্টগ্রাম নামাঙ্কিত রেস্টুরেন্ট আছে। ভাবলাম, আমার ছোটভাই জহির শাহ (বর্তমানে চট্টগ্রাম প্রোগ্রেসিভ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক) তার স্ত্রী সুলতানা ও আমার ছাত্র ড. মুহিবুল্যাহ ছিদ্দিকী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রামে ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক) সম্ভবত ওদিকে রয়েছে। যদি দেখা হয়ে যায়! দেখা তো হলো না বরং স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। দুশ্চিন্তায় পড়লাম। ওরা বা আমি আমাদের নির্ধারিত বাসগৃহে পৌঁছুতে পারব তো? ... কিন্তু পৌঁছুলাম ঠিকই। বিস্ময়ের

ওপর বিস্ময়! ওরা তো পৌঁছেছেই। আবার খোশগল্পে মেতে আছে আমার সবচে' ছোট বোন শাহেদার (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর দিদারুল আলম চৌধুরীর স্ত্রী) ননদের জেদ্দাবাসী ছেলে শিপুর সঙ্গে। বেচারা অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমাদের ঢেরা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে? খুবই ভালো ছেলে। ওর মোবাইলে সবাই ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগে সচেষ্ট থাকলো অনেকক্ষণ।

২৯ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৬ মাঘ, ১৪১০ ● ৭ জিলহজ, ১৪২৪

শিপু আমার ছোটভাই জহির শাহ ও ড. মুহিবুল্যাহকে নিয়ে এলো। বেশ ভাল একটা পুনর্মিলন অনুষ্ঠান হলো আমাদের। তিন ভাই একত্রে! বোন, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন সব মিলে এক অপরূপ সমাবেশ! আমি আর বাইরে বেরুলাম না। একবার তেতলায় গিয়ে হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলাম। তিনি ভীষণ সদাশয়। একটু পর আমার জন্য মিষ্টি ও *সৌদী গ্যাজেট* শীর্ষক ইংরেজি দৈনিক পাঠালেন। ক'দিন পত্রিকা পড়তে না পেরে আমি খুব অসহায় ও বিচ্ছিন্ন বোধ করছিলাম। অন্যেরা ধর্মকর্মে এতোই মশগুল থাকেন যে খবরের কাগজ পড়া আদৌ কোন জরুরি ব্যাপার নয় তাঁদের কাছে। ভাগ্যিস মুরাদুল্লাহ-ভাই তার ব্যতিক্রম। সেদিনের কাগজে দুটি সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় পেলাম। একটি হলো সৌদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নাইফ বিন আব্দুল আজিজ ঘোষণা করেছেন যে, হজে যারা গোলমাল সৃষ্টি করতে চাইবে তাদের মিনার তাঁবু শহরে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এর যথার্থ তাৎপর্য বোঝা গেল না। আরেকটি খবর হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থায়ও ইরাক থেকে ৪১,০০০ জন হজ করতে এসেছেন। অথচ চুক্তি হয়েছিল ৩৩,০০০ জন আসবেন বলে। অর্থাৎ ৮,০০০ জনের অতিরিক্ত আগমন।

হারাম শরীফে জোহরের নামাজ পড়ে এসে মধ্যাহ্নভোজন। আয়োজন বেশ ভালোই। মাঝারি আকারের রূপচাঁদা মাছ ভেজে সঙ্গে অল্প ঝোল। তাছাড়া আলু ভর্তা আর ডাল। সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের তিন মহিলার তৈরি অপূর্ব সালাদ। আমাদের বাড়ি থেকে নেমে রাস্তার কোণায় ছোট ফলমূলের দোকান। জাহাঙ্গীর নামের

চট্টগ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে আমার বোন বুলবুলের বেশ আলাপ জমে উঠেছে। সে অল্প কিছু কিনতেই টমেটো, পেঁয়াজ, লেটুস, শসা (কুকামবার), গাজর, আঙুর প্রভৃতি অনেক কিছু যেন জাহাঙ্গীর তার বড়বোনকে বিনামূল্যে দিয়ে দিল। চাঁদগাঁও নিবাসী ছেলেটি পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজতবাসে উধাও হয়ে গেল। তার 'আকামা' কিংবা ওয়ার্ক পারমিটে গণ্ডগোল ছিল সম্ভবত।

বিছানায় একটু গড়িয়ে আছরের নামাজের জন্য প্রস্তুত। বাথরুমে গেলে আয়নায় চেহারা দেখে নিজেকে ভিন্ন মানুষ মনে হয়। মাথায় ছোট চুল সব শাদা, প্রকাণ্ড টাকের আত্মপ্রকাশ। মুখে হাত দিলে ভেলভেটের মসৃণতা। ক'দিন শেভ করা হয়নি। বাবার চেহারা ভেসে ওঠে স্মৃতিতে। মুখচ্ছবি স্নিগ্ধ তার ওপর যেন এক নুরানী ছাপ। দীর্ঘকাল সেই চেহারা সামনে নেই। নাদির, জহির, মুহিবুল্যাহ কাউকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল না। তবে ফারুক ভাই আর রব্বানী সাহেব 'যথাপূর্বক তথা পরং'-না, বরং আগে থেকে রাখা দাড়ির সৌন্দর্য্য আরেকটু বৃদ্ধি পেয়েছে, মনে হল।

অনেক প্রতীক্ষার পর মিনা অভিমুখে যাত্রার ঘন্টা বাজল। পূর্বঘোষিত রাত ২-৩০ মিনিট বহাল থাকল। মিনা যাবার বাস এসেছে শুনে আমাদের মধ্যে যথারীতি হুলুস্থুল পড়ে গেল। লটবহর বহন করে বাসে চেপে বসলাম। চমৎকার রাস্তা দিয়ে চললাম। নতুন মরুদ্যান শহর, তাঁবু নগরী মিনা। আজ বিশ লাখ লোক এখানে জমায়েত হবে। জানা দরকার, মক্কার মসজিদের ধারণক্ষমতা রয়েছে দশ লাখ লোকের।

এবারের হজের ব্যাপারে আরো কিছু নতুন তথ্য অবহিত হলাম। মিনায় ১০,০০০ খাবারের দোকান রয়েছে। সৌদী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিনায় ২৯টি, আরাফাতে ৪৬টি এবং মুজদালিফায় ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছেন। আবহাওয়া ১৭ থেকে ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। দমকল ও এম্বুলেন্সের উপযুক্ত ব্যবহার রয়েছে। টেলিফোন ব্যবহারে ২০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতার ভাবনা-চেতনা ও মানসিক প্রশান্তি তীর্থযাত্রীদের চোখেমুখে পরিস্ফুট। বলাবাহুল্য, শারীরিক কষ্ট এবং অসুবিধাও

রয়েছে যথেষ্ট। খুব ধীরে সুস্থে অতিক্রম করলাম এই সামান্য পথ। ১০৪ নম্বর তাঁবুতে আমাদের আশ্রয়। আমরা একজন আরেকজনের পাশে চাদর কম্বল বিছিয়ে কার্পেটের ওপর নিজেদের আস্তানা গাঁড়লাম। কোথাও কিছু ফাঁকা জায়গা জিনিসপত্র রাখার জন্য। তাঁবুতেই হুজুরের পরিচালনায় নামাজ, এবাদত ও ধর্মালোচনা চললো।

সকালে একটি স্টল থেকে চা খেতে গিয়ে বিপ্লব ও তার বন্ধু - দুই ঢাকাই তরুণের সঙ্গে পরিচয়। ওরা কিছু খাদ্য পরিবেশন করল আমাদের।

পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত আরো দুটি খবর দেই : ইন্দোনেশিয়া থেকে এবার হজ করতে এসেছেন ২,০৫,০০০ নারী-পুরুষ। আরো ৩০ হাজার লোক টাকা জমা দিয়ে আসতে পারেননি। এর মধ্যে রয়েছেন একজন জনপ্রিয় অভিনেতা আলেক্স কোমাং। তিনি সাড়ে চার হাজার ডলার জমা দিয়েও আসতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাক, আমাদের একজন জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন এসেছেন এবং তিনি আমাদের দলেই আছেন। অদূরে, আমার উল্টো দিকে শুয়ে আছেন। মাঝে মধ্যে ভিড় জমে যাচ্ছে তাঁর চারপাশে।

অন্যটা একটা দুঃসংবাদ। ক'দিন আগে একজন বাংলাদেশী ৩৬ হাজার পিস ক্রেপটাজিন না কি-একটা স্টিমুলেন্ট নিয়ে জেদ্দায় ধরা পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে অল্প বয়স্কদের কাছে পিলটি নাকি বেশ জনপ্রিয়।

৩০ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৭ মাঘ, ১৪১০ ● ৮ জিলহজ, ১৪২৪

রাত একটায় বাসে রওনা দিলাম আরাফাতের উদ্দেশ্যে। সবার জায়গা হলো না। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে গিয়ে দেখি নিমগাছের ছায়ায় অনেক খালি তাঁবু। কে জানি বলল, জেনারেল জিয়া এই নিমের চারা এখানে রোপণের জন্য প্রেরণ করেন। সেজন্য এগুলোকে কেউ কেউ 'জিয়া বৃক্ষ' বলে থাকেন। সেখানে আমরা যে খালি তাঁবুতে আস্তানা গাঁড়তে উদ্যোগ নেই, কিছুক্ষণ পরই আরেক দল এসে বলে ওটা তাদের জন্য নির্ধারিত। এভাবে কয়েকবার তাঁবু বদলাতে হল আমাদের।

৩১ জানুয়ারি, ২০০৪ ● ১৮ মাঘ, ১৪১০ ● ৯ জিলহজ, ১৪২৪

এখানে আমাদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সৌদী সরকারের প্রদত্ত উটের বিরিয়ানি। উল্লেখ্য যে, 'আরাফাত' বা 'আরাফাহ্' হলো হজের কেন্দ্রভূমি। আল্লাহর রসুল (সা.) এখানে তাঁর বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেছিলেন। এখানে এখনও একটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তা না হলে হজ সম্পন্ন হবে না। পরবর্তী বছরে আবার কোরবানী সহ হজ করতে হবে। রসুল (সা.) বলেছেন, 'হজ হচ্ছে আরাফাহ্'।

আমাদের হজ সমাপন হতে চলল। বসে ও দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলাম হজের অনুষঙ্গরূপে।

আছর নামাজের পর দাঁড়িয়ে শাহ সাহেব মুরাদুল্লাহ-ভাই প্রায় একঘণ্টা ধরে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মুনাজাত করলেন। প্রায় প্রতিটি সদস্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে নাম ধরে - বিশেষ করে আমার শ্বশুর সৈয়দ আলী আহসান ও চাচা-শ্বশুর সৈয়দ আলী আশরাফ প্রমুখের নামোল্লেখ করে খাস দোওয়া করলেন। অনেকেই কেঁদে-কেটে মার্জনা ভিক্ষা করল মহাপ্রভুর দরবারে। তারপর সবাই একজন আরেকজনের সঙ্গে কোলাকুলি করলাম। এখানেই এক পর্যায়ে আমার সঙ্গে আলাপ হলো গণস্বাস্থ্য এন্টিবায়োটিক লিমিটেডের আমার সহকর্মীতুল্য জনাব আতা-এ-মওলা সাহেবের সঙ্গে। তিনি এসেছেন স্ত্রী-কন্যা সমেত।

রাত সাড়ে দশটায় বাসে মুজদালিফাহ রওনা দিলাম। ভিড়ের জন্য অল্প পথ এসে পৌঁছাতে ৩-৫০ মিনিট হলো। এখানে মাগরেব ও ইশা একসাথে পড়লাম। ৭০টি ছোট পাথর কুড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে রইলাম। মুজদালিফাহ হচ্ছে আরাফাত ও মুহাস্সির নামক দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান। মুজদালিফাহকে 'জাম'ও বলা হয়। পবিত্র কোরআনে একে 'আল মাশহার আল হারাম' বলে উল্লেখিত হয়েছে (*আল বাকারাহ* ২ : ১৯৮)।

১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৯ মাঘ, ১৪১০ ● ১০ জিলহজ, ১৪২৪

সকালের নামাজ শেষ করে বাসে মিনা রওনা দিলাম সবাই। আমি সামনের দিক দিয়ে উঠছিলাম। আমার ভাই নাদির শাহ মধ্যবর্তী

দরজা দিয়ে উঠে দুটো সীট দখল করেছিল। বাসে উঠে দেখি খালুজান ডিআইজি সাহেব সীট পাচ্ছেন না। এর আগে মিনা-আরাফাত জার্নিতে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাই ওখানে তাঁকে বসতে বললাম। আমি সামনে দাঁড়িয়েই রইলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মধ্য-আশিতে একবার হরতাল সত্ত্বেও ঢাকা-রাজশাহী যাত্রায় কলাবাগান থেকে ধামরাই একটা মিনিবাসে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এবারের মতো দাঁড়িয়ে যাবার কষ্টকর অভিজ্ঞতা জীবনে আর ঘটেনি।

মিনা পৌঁছুতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। তারপর আবার অনেকক্ষণ লাগল আমাদের তাঁবু খুঁজে বের করতে। বাংলাদেশ মিশন সামনে পেয়ে আমাদের একজন গিয়ে পথনির্দেশ চাইলো। নির্দ্বিধায় ওরা ভুল দিক দেখিয়ে দিল। যাহোক, প্রচণ্ড তৃষ্ণা আর ক্ষুধা নিয়ে আমরা তাঁবুতে ফিরলাম।

বিকেলে সদলবলে শাহ সাহেব মুরাদুল্লাহ-ভাই কংকর নিক্ষেপ করতে গেলেন। আমার স্ত্রী ও আমার পক্ষ থেকে তিনি স্বয়ং বড় শয়তানকে ৭টি করে পাথর ছুঁড়লেন। ইতোমধ্যে খবর এসেছে আমাদের কোরবাণী হয়ে গেছে। মস্তক মুণ্ডনের জন্য সেলুন খুঁজে পেলাম না। কাছে পেলাম এক নকল নাপিত। দ্বারভাঙ্গার বিহারী। ক্ষুরের মধ্যে নতুন ব্লেড লাগিয়ে কাজটা করে যাচ্ছে কোনরকমে। পারিশ্রমিক অবশ্য ঠিকই দশ রিয়াল গুণে নিল।

এরপর আরেক সংগ্রাম : লাইন দিয়ে বাথরুমে ঢোকা। ইহরামের পোশাক খুলে ফেলা হলো। সেদিন প্রস্তর নিক্ষেপে বহুলোকের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ সবাইকে ব্যথিত করে তুললো।

২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২০ মাঘ, ১৪১০ ● ১১ জিলহজ, ১৪২৪

দলের সঙ্গে সময়ের মিল হচ্ছে না সবার। আমরা ক'জন একত্রে রওনা দিলাম। অবশ্য শেষ অবধি আমার স্ত্রী ও ছোট বোনকে আমি একটি স্টেশন ওয়াগনে চড়িয়ে দশ রিয়াল করে ভাড়া দিয়ে এলাম আর নাদির শাহ টানেলের ভিতর দিয়ে হেঁটে এলো।

আল মক্কাহ আল মুকাররমাহ-এ ফিরে এলাম। আমরা তাওয়াফ শুরু করলাম পরমানন্দে। ভিড় সত্ত্বেও মনে বড় প্রশান্তি। শেষ পর্যন্ত

এত বড় একটা কঠিন কাজ করতে পারলাম - এটা ভাবতেই অবাক লাগছে। তারপর সাফা-মারওয়া সায়ী। সাতবার করে ঘুরে আসা। প্রথম দিকে তিনবার বীরপুরুষের মতো দ্রুত পদক্ষেপে চলতে হয় পুরুষদের। আরবিতে একে বলে রমল। এটা শুধু পুরুষদের জন্য।

আবার ফিরে এলাম মিনায়। এবার বাসে। মাগরেবের পর একটা খাবার দোকান থেকে কিছু কিনে খেলাম নাসরীন ও আমি। বুলবুল বের হয়নি। একটু খোঁজাখুঁজি করে ড. মুহিবুল্যাহ ছিদ্দিকী ও জহির শাহদের তাঁবু বের করলাম। আমার স্ত্রী তার জা সুলতানার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্যে ঢুকলো মহিলা-মহলে। আমি পুরুষদের কক্ষে। পরিচিত আরো কয়েকজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা। বিশেষ করে সেই জামারাত ট্র্যাজেডি। পরে ওদের তাঁবুর জামায়াতে ইশার নামাজ পড়লাম। নামাজের আগে-পরে দু'দফা চা পান হল। চাটগেঁয়েদের জন্য এটা স্বাভাবিক!

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২১ মাঘ, ১৪১০ ● ১২ জিলহজ, ১৪২৪

মিনা থেকে মক্কা ফেরা। আরেক যুদ্ধ। দুই মহিলা ও আমি। অনেক অনিশ্চয়তা ও অপরিসীম কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে মিনার জনবাহুল্যের কারণে দুর্গম পথ পেরিয়ে গাড়ির অনুসন্ধান। অবশেষে প্রত্যেকে দেড়শ' রিয়াল করে ভাড়া দিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে এলাম মক্কার এক উঁচু এলাকায়। এটা আমাদের বাসভবনের খুব কাছে নয়। তখন আমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত। সামনে একটা চমৎকার রেস্তোরাঁ দেখলাম। বসে পড়লাম ফুটপাথের টেবিল-চেয়ারে। প্রচুর চিকেন ব্রোসট, ফ্রেন্স ফ্রাই আর ফ্রুটজুস খাবার পর সুস্থ বোধ করলাম।

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২২ মাঘ, ১৪১০ ● ১৩ জিলহজ, ১৪২৪

সময়মত নামাজ পড়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। পুরো শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। রুটি-আমলেট নাশতা এলো। পরে আরাম করে গরম পানিতে গোসল করলাম।

দলের জাকারিয়া সাহেব সবসময় হাসিখুশি, পরোপকারী। কার কী কাজে আসতে পারেন, সবসময় তাই খুঁজছেন মনে হয়। নারিন্দায় জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার, খুলনার মানুষ, হুজুরের প্রতি খুবই অনুরক্ত। আমাকে একটু মান্যগণ্য করেন। কারণ তিনি হলেন আমার 'নাতি ছাত্র'। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের তাঁর কোনো শিক্ষক আমার ছাত্র। সেজন্য খুঁজে বের করেছেন এই আত্মীয়তা। তাঁর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করে জোহরের নামাজ পড়তে গেলাম। ভেতরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। চত্বরের শেষদিকে রাস্তায় আরো হাজার হাজার মুসল্লির মধ্যে বিছিয়ে দিলাম আমাদের জায়নামাজ।

ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করলাম তেলাপিয়া মাছ, আলু ভর্তা ও ডাল দিয়ে।

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৩ মাঘ, ১৪১০ ● ১৪ জিলহজ, ১৪২৪

বেশ ভোরে শয্যাত্যাগ। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল কয়েকবার। আমাদের কক্ষের তিনজনই নামাজ পড়তে হারাম শরিফে চলে গেছেন। দু'জন ফিরেও এসেছেন। এর মধ্যে অবশ্য আমি নামাজ পড়ে নিয়েছি করিডরে। অসুস্থ বোন বুলবুলকেও দেখতে গেলাম। আমার স্ত্রী রানীর সঙ্গে নামাজ পড়তে গিয়েছে, ফেরেনি। বুলবুলের জ্বর একটু কমেছে। ওর কাছে বসেই প্রাতঃরাশ সারলাম।

পরে ফারুক ভাইয়ের মোবাইলে ঢাকা-জেদ্দা যোগাযোগের চেষ্টা করা হলো। কিন্তু সফল হলো না সে প্রয়াস।

গত ক'দিন ধরেই খুবই ধকল যাচ্ছে শরীরের ওপর। তেতলায় হুজুরের কক্ষে গেলাম। কিছুক্ষণ খুবই ভালো কাটল। সুন্দর আলোচনা হলো নানা বিষয়ে। তাঁর কাছ থেকে গতকালকের *এ্যারাব নিউজ* পাওয়া গেল।

নাসরীনকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়তে গেলাম। পরে মিসফালাহর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে একটা ভুল রাস্তায় চলে গেলাম। বাঁদিকে একটা বড় রাস্তায় আধুনিক ও বেশ বড় একটা ফার্মেসিতে ঢুকে কিছু সওদা করলাম। এক বাঙালি ফল বিক্রেতা দুটি আলুচা খেতে দিল। দাম বেশি মনে হওয়াতে আমরা কিছু না কিনেই ফিরে আসছিলাম। কিন্তু ওর জোরাজুরিতে নিতেই হলো।

সামনে পাওয়া যাওয়াতে আমাদের বাসার দুই কাজের ছেলে সোহেল ও রুবেলের জন্য উপহার সামগ্রী কিনে ফেললাম। একজনের জন্য জায়নামাজ, অন্যজনের বাবার জন্য 'হাজী গামছা' আর তসবীহ। হারাম শরীফের সামনে রাস্তায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ইশার নামাজ পড়লাম।

বাসায় ফিরে আমার দুই ভাইবোনের দুই আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। নাসরীন ঢাকার বাসার সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলো। সবার সঙ্গে একটু একটু কথা বলে নিলো।

৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৪ মাঘ, ১৪১০ ● ১৫ জিলহজ, ১৪২৪

আজ এক মহাদিন। নাদিরের নতুন কেনা জায়নামাজে বসে হারাম শরীফের সামনের চত্বরে লক্ষ জনতার মাঝে জুমার নামাজ আদায় করলাম।

বুধবারের পত্রিকায় সেই রোববারের ট্র্যাজেডি - শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের সময় যে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটেছিলো - তা নিয়ে নানা আলোচনা। কেন হলো? কার দোষ? কেন শান্তিরক্ষা বাহিনী যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলো? আবার অন্য লেখাও আছে - যেখানে স্কাউটরা যে খুব উপযুক্তভাবে সেবাদান করেছে তার বর্ণনা।

আরেকটা খবর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো : বর্তমানে মক্কায় নাকি ইন্দোনেশিয়ার এক লক্ষ কাজের লোক (মহিলা) রয়েছে। এদের মধ্যে ৭০,০০০ হজ পালন করেছে এবার। তবে এদের মধ্যে ৪০% শতাংশেরও উপযুক্ত কর্মপত্র আছে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

খালেদ তাগাসি নামে একজন সৌদী কর্মী মিনায় কর্মরত ছিলেন। তিনি জামারাত (যেখানে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতে গিয়ে প্রায় দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যায়) এবং কাবার মধ্যে ক্যাবল কার-এর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে, এর ফলে বয়স্কদের বিশেষ সুবিধা হবে। একজন ডাচ তীর্থযাত্রী লিখেছেন, ইউরোপে নিরাপত্তা বাহিনী যেভাবে ফুটবল খেলার মাঠে গণ্ডগোল থামায় সেরূপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তবে বুধবার বিশেষ বাহিনীর হস্তক্ষেপে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৫ মাঘ, ১৪১০ ● ১৬ জিলহজ, ১৪২৪

শরীরে দেখা দিল নানা উপসর্গ। শনিবার সকালে ফারুক ভাই, বুলবুল ও আমি গেলাম আল জিয়াদে হাসপাতালে। খুবই কাছে। বুলবুলকে ডাক্তারই ঔষধ দিয়ে দিল। ফারুক ভাইও কীভাবে জানি ঔষধ নিয়ে ফেললেন। আমি লম্বা লাইন দেখে পিছিয়ে গেলাম। পাশে একটা ফার্মেসী দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কাশির ঔষধ কিনলাম। একসময় ড্রাই এ্যাকজিমার জন্য ভারতীয় একটা মলম ব্যবহার করতাম, যা দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য। এমনকি কলকাতায়ও একবার খুঁজে পাইনি। ঔষধটি আসলে বেলজিয়ামের তৈরি। সেখানে পেয়ে এটিও কিনে নিলাম।

হারাম শরীফের সামনে মাগরিবের নামাজ পড়লাম রব্বানী সাহেব সহ। তারপর দু'জনে মিসফালাহর দিকে রওনা দিলাম। ঢাকা হোটেলে (আসলে রেস্তোরাঁ) বড় বড় পুরি ভাজতে দেখে রব্বানী সাহেব তৎপর হয়ে উঠলেন। দু'জনে কিছু দেশী নাশতা খেয়ে তৃপ্তি পেলাম। একটা মানি চেঞ্জার দেখে তিনি বাংলাদেশী টাকার বিনিময়ে রিয়াল নিলেন। মক্কা শরীফে এরকম দেশী মুদ্রা ভাঙানো যাবে এটা ছিল কল্পনার অতীত। দেশে ফোন করতে চাইলেন। কিন্তু সংযোগ পেলেন না।

নাসরীন, বুলবুল আয়শা মসজিদে গিয়েছিল অন্যান্যদের সঙ্গে। সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে উমরাহর উদ্দেশ্যে।

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৬ মাঘ, ১৪১০ ● ১৭ জিলহজ, ১৪২৪

অন্য রাতের মতো গত রাতেও তেমন ঘুম হয়নি। তবে জ্বরটা ছাড়ল মনে হয়। সকালে হালুয়া-রুটি চা-নাশতা সেরে নাসরীনসহ বেরিয়ে পড়লাম। হারাম শরীফের সামনের চত্বরের লাগোয়া বিরাট শপিং কমপ্লেক্স বিল্ডিং-এ বিন দাউদের দোকান। এখানে আসার উদ্দেশ্য পত্রিকা কেনা। বহু জিনিস দেখেশুনে অবশেষে দু'জনে দুটো নিত্যব্যবহার্য ক্রীম আর পত্রিকা কিনে বেরুলাম। কমপ্লেক্সের অন্য একটা খাবারের দোকান থেকে পিজা আর লেবুর রস কিনে বিদেশী বহু নর-নারীর মতো ফ্লোরে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে খেলাম।

আজকের *সৌদী গ্যাজেট* পত্রিকায় হজ বিষয়ক কোনো খবর বা নিবন্ধ নেই। একটা ছবি আছে কেবল।

আমার ছোটবোন শাহেদার ননদের ভাসুর কালু শাহ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওঁর দোকান দেখতে। চাঁটগার আরেক বিশেষজ্ঞ সহকর্মী সেই দোকানে আছেন। তিনি হলেন মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। বাড়ি ফটিকছড়ি হলেও চট্টগ্রাম শহরের নর্থ নালাপাড়ার বাসিন্দা। মাত্র ক'দিন পর এঁদের দু'জনেরই চাকুরী চলে যাওয়ার আশংকা। বিশ্বস্তভাবে এবং বহু মূল্যবান সোনা-রত্নের ব্যবসা তাঁরা মালিকের পক্ষে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পরে আমার বেয়াইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে শেরাটনের ফাস্টফুড খেলাম। তিনজন তৃপ্তিসহকারে ভুরিভোজন করলাম বলা চলে। তারপর হারাম শরীফের পশ্চাৎ দিকের একটা অংশে হাজার হাজার মুসল্লির সঙ্গে ইশার জামাতে শামিল হলাম।

৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৭ মাঘ, ১৪১০ ● ১৮ জিলহজ, ১৪২৪

বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হয়েছিল। ক্লান্ত, তার ওপর প্রচণ্ড কাশি। রাত্রে ঘুম হলো না। সকালেও না। বিকেলে সামান্য ঘুম হলো। জোহর, আছর পড়তে হলো করিডরে দাঁড়িয়ে। মাঝে মধ্যে *হিস্টরি অব মক্কা* গ্রন্থটির ওপর চোখ বুলাচ্ছি। খুবই ভালো লাগছে।

শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও রব্বানী সাহেবের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ পড়তে চললাম হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে। পরে বিন দাউদের দোকান থেকে একখণ্ড *সৌদী গ্যাজেট* সংগ্রহ করে চললাম মিসফালাহর দিকে। রব্বানী সাহেব কিছু খেতে আগ্রহী। আগের দিন তিনি আমাকে খাইয়েছিলেন ঢাকা রেস্টুরেন্টে আজ আমি তাঁকে আপ্যায়ন করলাম চিটাগাং রেস্টুরেন্টে। ওখানেও তাঁর পরিচিত লোকজন বেরিয়ে গেল। তবে আমাদের মতো কম খানেওয়ালাদের সমাদর একটু কম মনে হলো। ওখানে শুক্রবারের *ইত্তেফাক* ঝুলন্ত দেখলাম একটি বাজে-মালের দোকানে। আমি 'সাহিত্য-পাতা' দেখে কিনবো। *ইত্তেফাক* আমার বাসায় রাখা হয় এবং নির্দেশ দেওয়া আছে যে, সব ক'টা কপি যেন সংরক্ষণ করা হয়। তাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু

থাকলে তক্ষুণি কিনে পড়ব বলে অনুরোধ জানালাম পত্রিকাটি নামিয়ে দেখাতে। কিন্তু দোকানদার রাজী হলেন না। অনেকেই নাকি মেঘনার লঞ্চ দুর্ঘটনার খবর পড়ে পত্রিকা না কিনে চলে যায়। বললাম, সে খবর তিনদিন আগে সৌদী পত্রিকায় আমি পড়েছি। কিন্তু কার সঙ্গে কিসের আলাপ! ভদ্দরলোকের এক কথা! কিনলে নামাবেন এবং দেখতে দিবেন। নইলে নয়। আমি গ্যারান্টি দিলাম না। সে সন্ধ্যায় মিসফালাহ আমার সঙ্গে 'মিসফায়ার' করলো মনে হয়। ইশা পড়তে হারাম শরীফ। আবার সেই প্রশস্ত চত্বর আমাদের উদাত্ত আহ্বান জানালো। পাশের মুসল্লি এক বেলুচ। সামান্য আলাপ হলো। তাঁদের নাকি জনপ্রতি ৯৪,০০০ রুপি খরচ লেগেছে হজের জন্য।

সন্ধ্যায় হুজুর মুরাদুল্লাহ-ভাই এলেন খোঁজখবর নিতে। আমি তাঁকে সৈয়দ আলী আহসানের *হে প্রভু আমি উপস্থিত* বইটি পড়তে দিলাম। তিনি আমাকে *হিস্টরি অব মদিনা* বইটি কিনতে নিষেধ করলেন। আমাকে এক কপি উপহার দেবেন। তাঁর সৌজন্যে আমি আবার মুগ্ধ হলাম।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৮ মাঘ, ১৪১০ ● ১৯ জিলহজ, ১৪২৪

রাত্রে ঘুম হলো না। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে অস্বস্তি লাগছিল ক'দিন ধরে। কবে জানি একটা স্টুডিওতে মক্কার পশ্চাৎপটে স্বামী-স্ত্রী একটা ছবি তুলেছিলাম। আজ সকালে বাসগৃহের সামনেই একটা সেলুনে গেলাম। সেখানে একজন যুবক ও একজন বয়স্ক নাপিত। শেষোক্তজনের চেয়ারেই বসে পড়লাম। শুধু দাড়ি কামাতে বললে মনে হল সে বেশ অসন্তুষ্ট হলো। জানি না, আমি একটা ধর্মবিরোধী কাজ করতে যাচ্ছি এ কারণে কিনা! লোকটা নাকি কাশ্মীর থেকে এসেছে। হেলাফেলা করে কাটতে গিয়ে আমার ওষ্ঠ্যের একদিকে একটু জখম করে দিল।

সস্ত্রীক বিন দাউদের দোকানে গেলাম আবার। সামান্য কিছু সওদার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া আমার দৈনিক রেশন একটি সংবাদপত্র। ফেরার পথে একটা দোকান থেকে আলুচা ও লেবু কিনছিলাম। পাশের কাপড়ের দোকানের এক ভদ্রলোক এসে

আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মহানন্দে আবিষ্কার করলেন যে, যাঁর কথা তিনি বহু শুনেছেন অবশেষে তাঁকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সে আর কেউ নয়, স্বয়ং আমি! তাঁর বোন নাকি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী ছিল। তবে বর্তমানে মক্কায় অবস্থানরত আমার ছোটভাই জহির শাহ ও তার স্ত্রী সুলতানার কাছে আমার আগমন বার্তা পেয়েছেন। সে অবধি মানসিক দিক থেকে আমার তল্লাশে ছিলেন। বলা প্রয়োজন, তিনি সুলতানার চাচাতো বোনের স্বামী এবং ১৭/১৮ বৎসর ধরে মক্কায় অবস্থান করছেন। খুব খাতির করলেন আমাদের। ইনি রফিক উদ্দিন চৌধুরী। বাড়ি কক্সবাজার।

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২৯ মাঘ, ১৪১০ ● ২০ জিলহজ, ১৪২৪

শেষরাতের দিক থেকে একটু সুস্থবোধ করছি। কাশির মাত্রা কমেছে। একবার কথা হয়েছিল ডাক্তারের কাছে যাবো। কিন্তু তার আর প্রয়োজনীয় মনে হলো না। এক পাতা স্ট্রেপসিল কিনে নিলাম।

আজ সকালে ফারুক ভাই আর রানী জেদ্দা চলে গেলেন তাঁদের আত্মীয়ের আহ্বানে। হজের বাধ্যবাধকতার অবসান ঘটেছে। তাঁদের একটা 'ব্রেক' দরকার।

এদিকে নবপরিচিত, অতি সজ্জন রফিক সাহেবের অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হচ্ছি। তাঁকে এক কপি *চট্টগ্রামে অদ্রে মালরো* শীর্ষক আমার লেখা এক ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার দিলাম।

আজকের *সৌদী গ্যাজেটে* প্রথম পৃষ্ঠায় বড় খবর : শারজায় বিমান দুর্ঘটনা। তাতে এক বাংলাদেশীও রয়েছে। ভেতরে 'বিজনেস কলামে' করাচী থেকে 'ডন' পত্রিকার উদ্ধৃতিতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির একটু আভাস; তাতে রয়েছে বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০০৩-এর মধ্যে বিগত দু'মাসে (রেমিট্যান্স মারফত) ১.৫৮ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে। আগের বছর করেছিল ১.৪৬ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে পাকিস্তান করেছে ১.৮৪ বিলিয়ন। অথচ এর আগের বছরে এই সময়ে তারা পেয়েছে ২.১৩ বিলিয়ন ডলার। ভারত, মেক্সিকো ও চীন এ ব্যাপারে আরো তেজি।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৩০ মাঘ, ১৪১০ ● ২১ জিলহজ, ১৪২৪

আজ আবার শরীর খারাপ দেখা যাচ্ছে সবার। খাদ্যবস্তু নিয়ে ওজর আপত্তি আছে অনেকের। সকালে আরবী রুটি ও ডিম ভাজি পছন্দ হল না। আমি যা খেলাম, বমি হয়ে গেল। পরে নাসরীনকে নিয়ে বিন দাউদের দোকান থেকে খবরের কাগজ কিনে মিসফালাহ গেলাম। সেখানে চিটাগাং রেস্টুরেন্টে পরোটা-ভাজি পছন্দ করলো আমার স্ত্রী। তাই নিজেরা খেয়ে বোন বুলবুলের জন্য কিছু নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

দুপুরে আমাদের আত্মীয় কালু শাহ (শাহেদার ননদের ভাসুর) এলেন অনেক ফলমূল নিয়ে এবং আমার জন্য এক কপি *এরাব নিউজ*। সুখ দুঃখের গল্প করলেন বিস্তর।

হারাম শরীফ থেকে ফেরার পথে হুজুরের সঙ্গে দেখা হলো পাহাড়ি পথে। তিনি সদলবলে যাচ্ছিলেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ে তিনি জানালেন যে, তিনি আমার সাহিত্যকর্মে আগ্রহী।

বিকেলে ফোন করা হলো দেশে। আমার মেয়ে প্রসন্না বললো যে, নাতি রা'দ অসুস্থ। তাতে দু'জনের মন খারাপ হয়ে গেল। আসলে জন্মের পর থেকেই সবাই রা'দকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আজকের কাগজে তেমন কোন খবর নেই। তবে আগামীতে স্থানীয়দের হজে ঘন ঘন আসা বন্ধ করার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা রয়েছে। তাছাড়া ফ্রান্সে হিজাব বিষয়ে যে আইন হয়েছে তার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২২ জিলহজ, ১৪২৪

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম। উঠে নামাজ পড়লাম। চা, নতুন নাশতা। তারপর নাসরীনকে নিয়ে বিন দাউদের দিকে রওনা। পথে রফিক মিঞার দোকানের একটু আগেই দেখি হকারের পত্রিকা স্ট্যান্ড। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও *সৌদী গ্যাজেট* কিনলাম। তিনি নিজেই কিনে আপ্যায়িত করতে চান আল্লাহর মেহমানকে ।

ক'দিন ধরে আমাদের বাথরুমে পানি পড়ে যাচ্ছে অথচ কল মেরামতের প্রয়াস নেই। হঠাৎ দেখা গেল পানি আর সরছে না।

ভাগ্যিস, আমি প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম বেশ আগেভাগেই সেরে নেবার অভ্যাস করেছি। অনেকেই কিছু কষ্ট পেল।

দুপুরে আমরা দু'জন নামাজ পড়তে যাবো তার আগে আমার ছেলে পাপ্পুর ফোন পেলাম। তার ছেলে রা'দ এখনো অসুস্থ। মন খারাপ। হারাম শরীফে আমার পাশে বসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এক ভদ্রলোক। পেশায় ডেকোরেটর। তাঁর সঙ্গে আলাপ জমলো ভাল। তাঁর প্রদেশ থেকে নাকি ৩০০০ লোক হজ করছেন এবার। আর ভারত থেকে প্রায় লাখখানেক।

মধ্যাহ্নে আজ 'ভোজ'ই হয়ে গেল বলতে গেলে। বিরিয়ানি, সালাদ, রাইতা, পেপসি ইত্যাদি।

আলহামদুলিল্লাহ! সন্ধ্যায় নামাজ পড়তে গিয়ে তাওয়াফ (কাবা প্রদক্ষিণ) করে নিলাম। মকামে ইব্রাহিম সন্নিকটে দু'রাকাত নামাজ পড়ার সুযোগ পেলাম। কিন্তু ইশার নামাজ পড়তে গিয়ে দেখা দিল বিপত্তি। দুটি মেয়ে হঠাৎ আমাদের দু'জনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। যাহোক, সব ভালো তার, শেষ ভালো যার। শেষমেষ রুকু-সেজদায় যাবার একটা উপায় হয়ে গেল।

রাত্রে ফারুক ভাইরা ফিরলেন। তাঁদের জেদ্দা সফরের অভিজ্ঞতা শোনা গেল। জেদ্দা শহরের অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য্য ছাড়াও সমুদ্রের মাঝখানে নির্মিত মসজিদে নামাজ পড়তে পেরে তাঁরা খুবই খুশি।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ২ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৩ জিলহজ, ১৪২৪

দেশের অবস্থা খারাপ শুনছি। আমার বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। বাচ্চারা অসুস্থ। দুই গৃহপরিচারক সোহেল, রুবেল নাকি ঝগড়া করেই চলেছে কেবল।

আজ সকাল বেলাটা আমাদের কেটেছে খুবই আনন্দে, উদ্দীপনায়। আমরা বেরিয়েছিলাম, বলতে গেলে, এক ধর্মীয় শিক্ষা সফরে। প্রথমে দেখলাম 'মহিষের পাহাড়'। এর ভেতর দিয়ে রাসুলে খোদা (সা.) মদিনা যাতায়াত করতেন। তারপর দেখলাম 'জবলে রহমত' - যেখানে তিনি বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন এবং যেখানে আদম-হাওয়ার পুনর্মিলন ঘটেছিল। বেহেশত থেকে বিতাড়িত হবার

পর এই পুনর্মিলন! এখানে উটের পিঠে হাওদা সাজিয়ে কেউ ছবি তুলছে বা উঠের পিঠে চড়ে একটু বেড়িয়ে আসছে। একটা সুসজ্জিত, সুন্দর উটের ওপর উঠে কাজল মা-খালাদের নিয়ে নিজেদের ক্যামেরায় ফটো উঠালেন। হায়রে, আমরা আবার বোকামি করে ক্যামেরা নিয়ে আসিনি! পাশে এক ক্যামেরাধারী উটওয়ালা আমাকে প্রস্তাব করে বসলেন : 'আমার উটে চড়ুন। পেছনে ভালো দৃশ্য উঠবে। তাছাড়া আপনাকে উটের পিঠে একটু ঘুরিয়ে আনবো। সব মিলিয়ে দশ রিয়াল দেবেন।' তাতেই রাজি হলাম। নাসরীন ছবি ওঠাতে সম্মত হল, কিন্তু উটের পিঠে উঠতে নয়। মারাত্মক এক স্মৃতি বটে! তাৎক্ষণিক পোলারয়েড ছবি দেখে সবাই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত। আমি বেশি খুশি হয়েছি জীবনে প্রথমবারের মতো উটের পিঠে চড়ে। এর আগে ১৯৫০ সালে হাতি, ১৯৫৭ সালে ঘোড়ার পিঠে চড়েছি। এদিকে উটের পিঠে চড়া তো ভারি মজা। ভয়ানক এক ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়াল। নাচতে নাচতে চললো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরেক ঝাঁকুনি দিয়ে নামালো। উটের লোকটি ছিল মানিকগঞ্জের বাড়ুন্ডি গ্রামের। এর আগে 'মহিষের পাহাড়ে' এক লোকের কাছ থেকে একটা ছবিসমৃদ্ধ এলবাম কিনেছি। তিনি বরিশালের। সেখানে আরেকজনের সাক্ষাৎ পেলাম চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি এলাকার লোক।

এবার আমরা জামারাত দেখলাম 'গ্রাউন্ড লেবেল' থেকে। ওপরে মঞ্চের মতো অবস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড ছুড়ে থাকে ছোট-বড় শয়তানের উদ্দেশ্যে। আর সেই নিমিত্তে তিনটি প্রতীকী স্তম্ভ করা হয়েছে। এরপর এলো কবরস্থান - জান্নাতুল মাওয়া। ঐতিহাসিক এলাকা। অল্প জায়গায় বহু কবর। সবার মনে যেন হারানো প্রিয়জনদের জন্য ব্যথা জেগে উঠলো।

বাসায় ফিরে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ হলো। সেদিন আবার পর পর দু'বার।

দুপুরে বিশেষ খাবার : চিকেন রোস্ট, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোল্ড ড্রিংকস। তবে বেশ কিছুদিন ধরে আমি কোল্ড ড্রিংকস পান করি না।

সন্ধ্যায় হারাম শরীফে একা গেলাম মাগরিবের নামাজ পড়তে। পরে কয়েকটি শপিং মল ঘুরে বিন দাউদের দোকান থেকে পত্রিকা

কিনে ফিরছি। পথে রফিক সাহেবকে তাঁর দোকানে পেলাম। কফি না খাইয়ে তিনি ছাড়লেন না। নানা আলোচনা শেষে একসঙ্গে ইশার নামাজ পড়তে গেলাম। তারপর নিজের বাসায়।

সেখানে এক বিপদ! বিছানার নিচে পানি উপচে উঠছে। কিসের পানি? বাড়িওয়ালার লোকজন প্রথমে বলেছিল, আমরা পানি ফেলেছি। এখন কী বলবে?

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৩ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৪ জিলহজ, ১৪২৪

সকালে আমাদের দলের বড় স্বেচ্ছাসেবক আইউব ও জাহেদ সাহেব এলেন। মদিনায় আটদিন খাবার বাবদ একশ বিশ রিয়াল করে ফেরত দিলেন সবাইকে।

ঘরে ঘুমানোর খুব অসুবিধা। নীচে মনে হয় পানির প্রস্রবন বয়ে যাচ্ছে। কার্পেট ভিজে গন্ধ ছড়াচ্ছে। এদিকে মুহূর্তে মুহূর্তে গমক গমক কাশি আসছে আমার।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৪ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৫ জিলহজ, ১৪২৪

আজ মক্কার বাইরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসতে হবে। তাই সকালে সবাই চমৎকার এক বাসে চেপে বসলাম। চললাম জারানা মসজিদ অভিমুখে। হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনা থেকে বিদায় হজে আসবার পথে সেখানে ইহরাম বেঁধেছিলেন। প্রশস্ত আধুনিক সড়ক, দালানকোঠা - সব মিলে এখনকার উন্নয়ন, ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণ সহজ হয়ে ওঠে। মসজিদে খুব সুন্দর ব্যবস্থা। আমাদের হুজুর শাহ্ সাহেব সুন্দর ভাষণ দিয়ে স্থানিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন। সেখানে একটা কূপ রয়েছে যাতে নাকি রাসুলে খোদার (সা.) থুথু নিক্ষিপ্ত হয়েছিল! রোগমুক্তির জন্য অনেকে তাই ওখানকার পানি নিয়ে যেত। বর্তমানে সেটা কুসংস্কার ভেবে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইহরাম বেঁধে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলাম সবাই।

বাসায় ফিরে সবাই একটু জিরিয়ে কাবা অভিমুখে রওনা দিলাম। পরে ফারুক ভাইয়ের নেতৃত্বে তাওয়াফ শুরু করলাম। কিন্তু এক চক্কর শেষ হবার আগেই তিনি সস্ত্রীক অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড ভিড়!

আরেকটু পর আমার ছোটবোন বুলবুলও লাপাত্তা। নাসরীন আর আমি আছি হাত ধরাধরি করে। অবশ্য ওর এক হাতে আছে দোওয়ার বই। আমি যা মনে আসছে তাই পড়ে যাচ্ছি তখন। শুধু কয়েকটি নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত প্রার্থনা আর হাত তুলে চুমু ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া।

সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ সেরে মকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে বেশ পেছনে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ পড়া হলো। তারপর জমজমের পানি পান। নাসরীন আমাকে টেনে নিয়ে গেল সাফার দিকে সাঈর উদ্দেশ্যে। মনে হল, তখন আমি ডান-বাম সব ভুলে বসেছি। সাতবার সাফা থেকে মারওয়া এবং প্রত্যাবর্তন করলাম। শেষে স্বল্প উচ্চতায় মারওয়া পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত। আমার জন্য আপাতত এই শেষ উমরাহ অর্থাৎ এই শেষ সাঈ। তাওয়াফ, ইনশাল্লাহ আরও এক বা একাধিক বার করবো। সুবিধামত একটা জায়গা বেছে পাকিস্তানী ও তুর্কীদের পাশে নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। জোহর ও জানাজার নামাজ শেষে বেরিয়ে এলাম মসজিদের ইমারত থেকে। পাশেই নরসুন্দররা আহ্বান জানাচ্ছে পাঁচ রিয়ালের বিনিময়ে কেশ মুণ্ডন করতে।

অনেক দোকানপাট পেরিয়ে ঢুকলাম বিন দাউদের দালানে। দু'জনে সেখানে কমলার রস আর চপসোয়ে খেলাম। দশ রিয়াল দামে। চমৎকার খাবার চপসোয়ে বিভিন্ন অর্ধসিদ্ধ সবজির চীনা রান্না। খেতে খুব ভাল লাগল। আস্তে আস্তে হেঁটে রফিক মিঞার দোকানের সামনে এসে পৌছলাম। তিনি আমাকে আজকের এক সংখ্যা *এরাব নিউজ* দিলেন। আমি বিন দাউদের দোকান থেকে *সৌদী গ্যাজেট* কিনে এনেছিলাম। আপাতত এই এক নেশা যা ছাড়ানো যাচ্ছে না। পত্রিকা পড়ে দেশ-বিদেশের খবর জানার জন্য মন উচাটন হয়ে থাকে।

বাসায় ফিরে অপেক্ষমান দুপুরের খাবার থেকে বাসমতি চালের ভাত আর একটা সরপুটি মাছ গলাধঃকরণের প্রয়াস পেলাম। তারপর একটা ঘুম। আবার পানি সংকট। বাদ মাগরেব বের হলাম। কিছু দোকানপাট পরিদর্শন করে দেখা গেল মিষ্টি তেঁতুল আর মধু পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত। সেদিনের হাজীরা

নিয়ে যেতেন। এখন এখানে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার বিক্রেতা। পরে কিনবো। হারাম শরীফে এসে ইশা পড়লাম। শান্ত্রী পরিবেষ্টিত ইমাম সাহেবকে দেখলাম নামাজ পড়িয়ে ফিরে যেতে। বেশ প্রবীণ লোক। সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

রফিক মিঞা যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দু'জনকে নিয়ে বিন দাউদের দালানের দিকে চললেন। তেতলায় গিয়ে হেরা রেস্তোরঁয় বসলাম। কাবাব, সালাদ, পেপসি, রুটি প্রভৃতির অর্ডার দিলেন। প্রথমে তিনজনের বসার জায়গা পেতে অসুবিধা হলো। একটু অপেক্ষা করতে হলো। চমৎকার খাবার খেয়ে এক স্পেশাল চা পান করতে চললাম তাঁর বন্ধু সাতকানিয়ায় এক বড় ব্যবসায়ীর দোকানে। মাশাল্লাহ! শান শওকত দেখে একটু বিস্মিত হতে হয় অবশ্যই।

ফেরার পথে আমাদের দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। রফিক মিঞার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, যার আবার বিশেষ ইচ্ছা তিনি ইলিয়াস কাঞ্চনকে খাওয়াবেন। রাজী করানোর দায়িত্ব আমাদের। দেখা যাক, কী করা যায়!

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৫ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৬ জিলহজ, ১৪২৪

মহিলা মহল চলে গেছেন বাইরে কোথাও। আমি একা হারাম শরীফে গেলাম জোহরের নামাজ পড়তে। ফেরার পথে বিন দাউদের দোকান থেকে পত্রিকা কিনলাম আর কিছু খাবার কিনে খেলাম। দেশের খবর জেনে সবাই চিন্তিত।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৬ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৭ জিলহজ, ১৪২৪

নাসরীনরা সদলবলে চলে গেল আয়শা মসজিদের উদ্দেশ্যে। ওরা উমরাহ করবে আজ। একটু বেলা হলে জনাব এবং বেগম গোলাম রব্বানীর সঙ্গে আমিও গেলাম সেখানে।

আমি গেলাম পর্যটকের ভূমিকায়। তবে ওখানে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করলাম মা আয়শাকে। ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য চরিত্র। মসজিদটির নির্মাণকৌশলও অসাধারণ। তীর্থযাত্রীদের সম্ভাব্য সকল সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

একটা দোকান থেকে এক কাপ চা খেলাম। দোকানদার সাতকানিয়ার লোক। পাশে এসে দাঁড়াল দু'জন - একজন কুমিল্লার, অন্যজন চাঁদপুরের। চকরিয়ার এক ফটোগ্রাফার ফটো তুললো। এটা শুধু আমার চা-পানের দৃশ্য! রব্বানী সাহেবদের দেখাদেখি পরে পাকিস্তানী এক ফটোগ্রাফারের পোলারয়েড ক্যামেরায় আরেকটি ছবি তুললাম - মসজিদের মিনার সহ। এক কপি *সৌদী গ্যাজেট* কিনে বাসায় ফিরলাম। দুপুরে কৈ মাছ ছিল মেনুতে। বিশ্রাম নিয়ে মাগরেব নামাজের জন্য সবাই রওনা দিলাম হারাম শরীফের দিকে। চারদিকে লোকারণ্য। একটু পরই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। নাসরীন আর আমি তাওয়াফ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিন পাক দিতে দিতেই এশার নামাজের সময় ঘনিয়ে এলো। প্রচণ্ড ভিড়। নামাজ শেষে আবার কাবা প্রদক্ষিণ। অবশেষে রাত ৯টার দিকে দেহমনে অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে ঘরমুখো হলাম। দেশে ফোন করার খুব ইচ্ছা হলো। আমিই প্রস্তাব করলাম। অন্য সময় আমার স্ত্রী এটা করে থাকে। কখনো বা আমি বরং বাধা দিয়ে থাকি। মেয়ের সঙ্গে কথা হলো। বাসায় ফিরে খাবারে পাওয়া গেল পাখির গোশত। কোয়েল পাখি।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৭ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৮ জিলহজ, ১৪২৪

সকাল থেকে মহা হুলুস্থুল। রব্বানী সাহেব অসুস্থ। কিবরিয়া সাহেবকে খবর দিতে চারতলায় গেলাম। একবার কথা হয়েছিল আমাদের কক্ষ কনডেমড হয়ে পড়াতে আমরা চারতলায় চলে যাব কিনা। রব্বানী সাহেব হার্টের রোগী। তিনি চারতলায় যেতে পারবেন না। কিন্তু ঐ বাড়ির অন্য একটি অংশে ভিন্ন গ্রুপে এসে অবস্থান করছিলেন ড. এম. শমসের আলী। দেশে জরুরি কাজ থাকায় তিনি আগেভাগে চলে গেছেন। তাই সেখানে হয়তো রব্বানী সাহেবকে দেওয়া যেতে পারে। কিছুক্ষণ পর আমাদেরকে দেখতে এলেন শাহ সাহেব মুরাদুল্লাহ ভাই। তিনি বেশকিছু ফলমূলও নিয়ে এলেন। ঘরের অবস্থা দেখে তিনি খুব অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কাকে জানি ডেকে

নানা নির্দেশ দিলেন। এতে ফল হলো। আমরা নীচতলার বাসিন্দারা পার্শ্ববর্তী, আর একটু নীচু ঢালুতে আল-ইউসর (Al-Yusr) হোটেলে স্থানান্তরিত হলাম। লিফটে চড়ে তেতলার একটি চমৎকার কামরায় এসে মনটা প্রফুল্ল হয়ে গেল। পরে হুজুর ইব্রাহিম সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেখতে এলেন। অবস্থার উন্নতি দেখে সবাই খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

অপরাহ্নে নিজের শরীরটাই ভালো লাগছে না। কোনরকমে শয্যা ত্যাগ করে (টেবিল-চেয়ার তো নেই যে বসে কিছু লেখাপড়া করা যাবে) হারাম শরীফে গিয়ে মাগরেব ধরলাম। নামাজ শেষ করে বিন দাউদের শপিং কমপ্লেক্স ঘুরে বেড়ালাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। ফেরার পথে এক কপি *সৌদী গ্যাজেট* কিনে ইশা পড়তে চলে এলাম। কিন্তু শাহী দরজায় ঘটলো এক বিপত্তি। পত্রিকা নিয়ে ঢুকতে দেবে না দ্বাররক্ষক। অদ্ভুত সব নিয়ম-কানুন! অতএব, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইরে বসতে হল। সেখানেও ইতোমধ্যে হাজার হাজার মুসল্লি বসে পড়েছেন। তবে আজ আমি অভ্যন্তরে যেতে চেয়েছিলাম এবং সেখানে জায়গাও খালি আছে দেখেছি। যাক, আমিও বাইরে অন্যান্যদের সঙ্গে নামাজে শামিল হলাম।

ফেরার পথে কয়েক কদম হাঁটলেই পড়ে রফিক মিঞার দোকান। কিন্তু আজ তিনি নেই। তাঁর ভাই কফি খাওয়ালেন। আশপাশ থেকে দেশী ভাইরা কথাবার্তা বলতে আগ্রহী হলেন। ওঁরা বললেন, সৌদী আরবে নাকি এখন ১৫ লক্ষ বাঙালি রয়েছে। অনুমোদিত-অননুমোদিত সব মিলে।

ফারুক ভাইয়ের জেদ্দায় কর্মরত আত্মীয়ের গাড়িতে এই ভিআইপি দলটি, তাঁর মামাতো বোন নাসরীন এবং নাদির ও বুলবুলকে নিয়ে তায়েফ ভ্রমণে গেলেন। আমার জায়গা হলো না। অনেক রাতে তাঁরা ফিরলেন। সে এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাঁদের! এদিকে আমি না খেয়ে রয়েছি। নাসরীন আমার জন্য একখণ্ড পিজা ও সালাদ এনেছিল। আপাতত তাই খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৮ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২৯ জিলহজ, ১৪২৪

সকালে কোথাও বেরুলাম না। দুপুরে নাসরীন সহ বেরুলাম। হারাম শরীফে গিয়ে জোহরের নামাজ পড়লাম। এক কপি পত্রিকা কিনে ফিরছি। রফিক মিঞাকে দেখলাম তিনটি প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। নাদির, বুলবুল ও আমার জন্য উপহার। নাসরীন ও অন্যান্যদের উপহার তিনি অন্য সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্‌র মেহমানদেরকে নাকি দিতে হয়। প্রায় জোর করে তাঁকে আমাদের হোটেলে নিয়ে এলাম। আমাদের উন্নত অবস্থা দেখে তিনি খুশি হলেন। আমাদের খাবারও তাঁর পছন্দ হলো। আলহামদুলিল্লাহ!

দুপুরে একটু ঘুমিয়ে আমরা চললাম শেরাটন হোটেলের দিকে - নাসরীন, বুলবুল ও আমি। আমাদের তিন স্বজন ওখানে রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ৯ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৩০ জিলহজ, ১৪২৪

সকাল দশটার দিকে নাসরীন আর আমি গেলাম তাওয়াফ করতে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে একেবারে কেতাবানুসরণে তাওয়াফ করলাম। প্রতি চক্করের পর বই দেখে নির্ধারিত দোওয়া পড়লাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, বয়স কমে গিয়ে দু'জনই যেন তরুণ-তরুণীতে পরিণত হয়েছি। শেষে মকামে ইব্রাহিমের পেছনে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। বিন দাউদ কমপ্লেক্সে গিয়ে ছেলে ও নাতির জন্য কিছু উপহার কিনলাম। দু'জনে চিকেন স্যান্ডুইচ ও সালাদ কিনে খেলাম। তারপর জমজমের পানি পান এবং এবাদত। জোহরের নামাজ শেষে ফিরছি। রফিক মিঞার দোকানের সামনে ফারুক ভাই (মনিরুজ্জামান) ও নাদির শাহ্‌-র দেখা পেলাম। একসঙ্গে ঘরে ফেরা। মধ্যাহ্নভোজন, একটু দিবানিদ্রা এবং উপাসনা। এর মধ্যে হাঁকছে একজন : চা গরম! সাতকানিয়ার একটি ছেলে একমাস আমাদের অনুপম সেবাদানে মুগ্ধ করে রেখেছে। যেমন আপ্যায়ন, তেমনি তার সম্ভাষণ!

মাগরেব পড়তে গিয়ে ডিআইজি মামুন সাহেবের সান্নিধ্য লাভ করলাম। তিনি নাকি জেনেছেন, মদিনা প্রবেশের পারমিশন এবং

হোটেল রিজার্ভেশন কোনটাই ঠিকমত হয়নি আমাদের। কী দুঃসংবাদ! তবে মুরাদুল্লাহ-ভাই এসে রাত্রে নাকি সবাইকে জানাবেন। নামাজের পর হারাম শরীফের একদম সামনে বেশ একটু উঁচুতে, একটা সৌদী দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে শোকেসের ওপর জাফরান দেখে আকৃষ্ট হলাম। এগিয়ে এলেন একজন সেলসম্যান। নরসিংদীবাসী। তিনি ১৮ বৎসর ধরে এদেশে আছেন। মাঝখানে কিছু বিপত্তি ঘটেছিল। উপার্জনের অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছেন। মাদ্রিদ থেকে আমদানীকৃত দুই প্যাকেট জাফরান কিনে ইশা পড়তে নেমে এলাম।

রাত দেড়টায় জাহেদ সাহেব এলেন দুই সঙ্গী নিয়ে সেবাকারীদের জন্য বখশিশ আদায়ের উদ্দেশ্যে। তাঁদের কাছে নাকি আমাদের দুই রিয়াল করে পাওনা আছে। আর দশ রিয়াল তাঁদেরকে দিতে হবে। প্রত্যেকের কাছ থেকে বার রিয়াল করে নেওয়া হচ্ছে। আর খবর হচ্ছে : সকাল দশটার মধ্যে আমাদেরকে মদিনা নিয়ে যাবার জন্য বাস আসবে। খুব ভোরে আমাদের নাশতা সেরে ফেলে দুপুরের খাবার খেয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে সকাল ন'টার মধ্যে। অদ্ভুত ব্যবস্থা!

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১০ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ১ মহররম, ১৪২৫

আরেকটি প্রায় নির্ঘুম রাত কাটল। খুব ভোরে হারাম শরীফে গেলাম নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে। ইমাম সাহেব অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠে নামাজ পড়ালেন। পরিপ্লুত চিত্তে হোটেলে ফিরছি। দেখি রফিক মিঞা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দোকানের সামনে। আমাকে আবার একটি উপহার, একটি নীল টুপি দিলেন। কিছুতেই দাম নিলেন না। তাঁর দোকান থেকে ইতোপূর্বে এই ধরনের টুপি তিন-চারটা কিনেছি। প্রথম কিনেছি মিনায়, লাল রঙের। টুপিগুলো আগের দিনের রুমী টুপির মত। কিন্তু ঝালরযুক্ত লেজশূন্য। ভেতরে লেখা আছে 'মেড ইন চায়না ইন চেক স্টাইল'।

কিছুদিন ধরে আমার টুপি পড়ার একটা সখ জেগেছে। প্রথমে এক নেপালী অধ্যাপক কাপড়ের একটি নেপালী টুপি উপহার দিয়েছিলেন। পরে পেলাম আমার সেই বিখ্যাত লাল উলের টুপি - যা পরে বিদেশে

বহু ভ্রমণ করেছি, বহু ছবি তার সাক্ষ্য। তারপর বছর চারেক আগে কাজাখস্তান গিয়েছিলাম। যাবার আগে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান হঠাৎ আমাকে বলেন : তুমি আমার জন্য কী আনবে? প্রশ্নটি অভিনব! তবু অপ্রস্তুত না হয়ে বললাম : আপনার জন্য একটা টুপি আনি। আমার মনে হয়, কাজাখদের নানা ধরনের টুপি আছে। তিনি বললেন : তাই করো, আমার জন্য একটা টুপিই এনো। আমি একই ধরনের কিন্তু ভিন্ন রঙের দুটি নতুন ধরনের টুপি এনেছিলাম শিমকেন্ত শহর থেকে। প্রথমে ব্রাউন টুপিটি মাথায় দিয়ে তিনি একটা টিভি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে আমার কাছ থেকে শাদাটি চেয়ে নিয়েছিলেন। এটা পরে তিনি সৈয়দ আলী আশরাফ স্মৃতি সেমিনারে যোগদান করেছিলেন। তার একটি রঙিন আলোকচিত্র আছে আমাদের কাছে। ...

হোটেল কক্ষে গিয়ে পাওয়া গেল পাখির রোস্ট। কিন্তু খাওয়ার আগ্রহ নেই বিন্দুমাত্র। তবু খেতে হল অল্পস্বল্প। জোহরের একটু আগে খবর পাওয়া গেল - বাস এসে গেছে, মালপত্র তোলা হচ্ছে। সে এক লঙ্কাকাণ্ড! বেশ কিছুক্ষণ দস্তাদস্তি, হুলুস্থুল ব্যাপার। কেউ আবার হারাম শরীফের দিকে গেলেন নামাজ পড়তে, কেউ রয়ে গেলেন গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়ল অপরাহ্ন ২-৩০ মিনিটে। পথে তিনবার থামল - চা-নাশতা, নামাজ। তাছাড়া রয়েছে প্রকৃতির আহ্বান।

তিন সপ্তাহের বেশি মক্কা অবস্থানের পর হজ সেরে আমরা চলেছি মদিনা মুনাওয়ারার পথে। সমৃদ্ধ সুন্দর আধুনিক মক্কা নগরী পেরিয়ে কালো পাথরের মাঝখানে প্রশস্ত সড়ক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের শেষ গন্তব্যে। সেখান থেকে যখন দেশে ফিরবো মুখোমুখি হবো কবি জসীমউদদীনের প্রশ্নের :

'মক্কার হাজী একটু দাঁড়িয়ে আমার
সালাম লও
মোর রসুলের সোনার মদিনা
কেমন আমারে কও।

মধ্যরাত্রে যখন আমাদের বাস মদিনার নিকটে এসে পৌঁছলো তখন আমার সুখনিদ্রার অবসান ঘটলো। পাশে আমার স্ত্রী, পেছনে আমার ছোটভাই ও বোন। ডান পাশে লালবাগের রয়েল রেস্টুরেন্টের মালিক জিয়াউদ্দিন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী। আমরা ছিলাম মধ্যবর্তী অবস্থানে। বিশাল বাসের মাঝামাঝি দরজার পাশে। সামনে-পেছনে দলের অন্যান্য সদস্যরা আছেন। সবাই চুপচাপ, এক জায়গায় এসে থামল বাস। বাইরে বেশ কলকণ্ঠ শোনা গেল। ভেতরেও দু'চারজনের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। এসেছি কি আমরা? দেরি আছে পৌঁছার? একটি চেকপোস্টের সামনে বহু গাড়ির পেছনে আমরা। ডান দিকে একটা চতুষ্কোণ মাঠের মতো দেখা গেল। তার তিনপাশে বহু বড় বড় গাড়ি। অর্থাৎ আমরা একা বা অন্যতম কেউ নই।

মনে পড়ে গেল, সাতাশ বছর আগের কথা। সেবারও প্রায় মধ্যরাতে এসে পৌঁছেছিলাম মদিনায়। মক্কা থেকে রওনা দিয়েছিলাম এক বিকেলে। চাচাশ্বশুর সৈয়দ আলী আশরাফ স্বয়ং এসে বাসে তুলে দিয়েছিলেন। বারবার বলছিলেন, 'ভুলো না - ফুনদুক আবদুল হামেদ। মসজিদে-নববীর প্রায় সামনে বাস থামবে। তার কাছেই হোটেল - যার নাম ফুনদুক আবদুল হামেদ। ইংরেজিতেও নাম লেখা থাকতে পারে। জিজ্ঞাসা করে নিও। ওখানে উঠে পড়ো।' সেই অচেনা ভুবনে অনিশ্চিত যাত্রায় গিয়ে উঠেছিলাম ফুনদুকে। সেই হোটেলের দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলার দু'পাশে ১০/১৫ জনের খাট পার হয়ে আমার বিছানার সামনে এসে পড়ে অবাক হয়েছিলাম। আমস্টারডামে একবার (১৯৬১) এক রাত ইয়ুথ হোস্টেলে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নাতিবৃহৎ এক ঘরে খাঁচার মত অবস্থান। প্রতিটি তেতলা খাট, এক ঘরে অন্তত ২০টি। আমার বিছানা মাঝখানে। সারারাত নির্ঘুম কাটিয়েছি। ...

মদিনার হোটেলেও বিশাল বপুর শ্বেতকায় রক্তবর্ণ উর্ধাঙ্গ অর্ধনগ্ন মানুষগুলোর নাসিকা গর্জন আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। পরিষ্কার বাথরুমে গরম পানি পেয়ে সেই মধ্যরাত্রে দাড়ি কামানো, দাঁত মাজা, গোসল সেরে বিছানায় শুয়ে-বসে রাত কাটালাম।

একটু পর আজান শুনে, মসজিদে-নববীতে গিয়ে নামাজ পড়লাম। তারপর নাশতা। তখন ছিল একটাই চিন্তা - একটা বিমানের টিকেট যোগাড় করে সেদিনই জেদ্দায় ফিরে যাবার প্রয়াস চালানো।

মনে হল, সেবার খুব কাছেই পেয়েছিলাম রসুলে খোদা (সা.)-র রওজা শরীফ। জেয়ারত সেরে একটু ঘুরলাম। তারপর সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের অফিসে গিয়ে জেদ্দা যাবার একটি চান্স-টিকেট ক্রয় করলাম। দুপুরে প্রচুর মুসল্লির সঙ্গে জোহরের নামাজ সেরে বিমান বন্দরে গেলাম একটি ট্যাক্সি নিয়ে। অনেক উদ্বেগভরা প্রতীক্ষার পর প্রার্থিত বিমান আসনও পেলাম। সেবারের স্বল্প সময়ের মদিনা সফর কিন্তু মনকে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। অনিবার্য কারণে আমাকে খুব দ্রুত মদিনা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। আর এবার যে আমাকে আটদিন অবস্থান করতে হবে সেটা জীবনে এক অনন্য অপার স্মৃতি হবে, এ রকমের একটা ধারণা যেন মনে ঢুকে গেল। ...

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১১ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ২ মহররম, ১৪২৫

কিন্তু এবার মদিনা পৌঁছে যা দেখছি তা সম্পূর্ণ অন্য রকম। সরকারী চেকপোস্টের সামনে অনেকক্ষণ ধর্না দিয়ে থাকতে হলো। তবে ওখানে যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি রয়েছে। কিন্তু এরপর বাস একবার ডানে, একবার বামে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের হোটেলের প্রায় কাছে এসে থামল। এরপর কিছু অপেক্ষা। অবশেষে আমরা চারজন চতুর্থ তলায় পেলাম একটি কামরা। অন্যদিকে আমাদের তিন মহিলা মিসেস রব্বানীকে নিয়ে গেলেন অন্য একটি কামরায়। ভালোই ব্যবস্থা। একটু ঠাসাঠাসি, তবু দুঃখ করার কিছুই নেই। বিছানা, কম্বল, গরম পানি সব মিলিয়ে আরামপ্রদ অবস্থান। সবচে বড় কথা, মসজিদে-নববীর খুবই কাছে, সেই সাতাশ বছর আগের মতো। সবাই একটু শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিলেন। ঘুমোলেন না কেউ। একটু পরেই তাহাজ্জুতের আজান। তারপর ফজরের আজান শোনা গেল। বেরিয়ে দেখি, হাজার হাজার নর-নারী এগিয়ে চলেছেন নামাজের উদ্দেশ্যে। তবে এখানে ব্যবস্থা একটু ভিন্ন। মসজিদের কাছে এসেই দেখা গেল, মহিলাদের নামাজ পড়বার এলাকা ভিন্ন। তাঁরা ডান পাশের একটা

গেটে ঢুকে পড়লেন। আমরা আরেকটু এগিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম।

আহ্হা! সে কি শাহী মসজিদ! মনে পড়ল কর্দোভার মসজিদের কথা। কিন্তু সেটা তো প্রায়-পড়ো দালান! তবু ১৯৬৬ সনে হিস্পান-দেশে সেই ঐতিহাসিক মসজিদ পরিদর্শনের স্মৃতি মনে অক্ষুণ্ন রয়েছে।

মসজিদের কথা তো বলে ফুরানো যাবে না। তাছাড়া মদিনায় আছে আরো কত স্মৃতি! রওজা, কবরগাহ, মসজিদ, যুদ্ধক্ষেত্র! কিন্তু শহরটির কথা একটু বলি। মদিনা মানেই তো শহর। কিন্তু এটা হলো শহরের মতো শহর। নবীজীর শহর। এটা সোনার মদিনা, এটা মদিনাহ্ মুনাওয়ারাহ - 'ইয়াৎরাব' ছিল একসময়ে এর নাম। তাছাড়া রয়েছে 'তাসবাহ' এবং 'তাবাহ' বলেও দুটি নাম। 'আগুন যেমন রূপোকে খাঁটি করে তোলে, তেমনি এই শহর সব মলিনতা দূরীভূত করে।' (*সহিহ মুসলিম*, ১৩৮৪ সংখ্যক হাদিস)

এ এক সুবাসিত নগরী!

মদিনার মাটি, মদিনার খেজুরও মানুষকে রোগমুক্ত করে বলে নবীজীর (সা.) উক্তি রয়েছে। মদিনার মানুষকে যারা অন্যায়ভাবে ভয় দেখাবে বা অত্যাচার করবে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি। 'সাপ যেমন গর্তে প্রবেশ করে, মদিনায় সেভাবে ফিরে আসে বিশ্বাস।'

আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁর প্রচারিত বিশ্বধর্মের জন্য বর্ষ গণনা করেছেন মদিনা আগমন থেকে। দশ বছর মদিনা অবস্থানে তাঁর ধর্মাবলম্বীদের জন্য রেখে গেছেন এক তুলনাবিহীন সমৃদ্ধ ও সংহত উত্তরাধিকার। তাঁর দুই প্রধান সহকর্মী (সাহাবী) আবু বকর ও ওমর (তাঁদের ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক) শুয়ে আছেন তাঁরই পাশে। আপন শয়নকক্ষে বাবা ও বাবার পরবর্তী খলিফাকে কবরস্থ করতে বিবি আয়েশা স্বয়ং সদয় অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

মক্কার আল-মসজিদ-আল হারামের পর পবিত্রতম এই মসজিদে-নববীর সুপরিসর, সুবিন্যস্ত অভ্যন্তরে নামাজ পড়বার সুযোগ পেয়ে পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু ক্লান্তির কারণে কিংবা শিক্ষার অভাবে তখন তাইয়াতুল মসজিদ বা প্রবেশ

উপলক্ষে যে দু'রাকাত নামাজ পড়তে হয়, তা পড়া হয়নি। যথারীতি সুন্নত ও ফরজ পড়া হলো। ইমামের কণ্ঠ ও উচ্চারণ পদ্ধতি একটু ভিন্ন মনে হলো। সম্ভবত মধুরতর। নামাজ শেষে দেহমনে এলো অপরিসীম প্রশান্তি। কিন্তু চোখ ভেঙ্গে ঘুমও যেন তাড়া করে আসছে। হোটেলের পাশে এক রেস্তোরঁয় চা ও লুসি খেয়ে এসে বিছানায় শুয়ে বেহুঁশ।

ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি ফারুক ও আমাকে ঘুমিয়ে থাকতে দিয়ে সবাই ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছে। অল্প নাশতা করে নানা গল্পগুজবে কিছু সময় কাটল। এর মধ্যে যোগাযোগ হলো আমার মামাতো ভাই মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে। কথা হলো, জোহরের সময় সে তেত্রিশ নাম্বার গেটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। মোহাম্মদ আলী কয়েক বছর ধরে মদিনায় আছে। নামাজ সেরে ওর নেতৃত্বে আমরা চললাম এক বাংলাদেশী রেস্তোরঁয়। মালিক সাতকানিয়ার লোক। কাচকি, পালং, গরুর গোশত, ডাল - এই ধরনের দেশী খাদ্য দিয়ে চমৎকার খেলাম। মোহাম্মদ আলী কিছুতেই পয়সা দিতে দিল না। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মদিনা শরীফে আটদিন থাকবো, আর এই বান্দা যদি এভাবে দিলদরিয়া হয়ে খরচ করতে থাকে, তাহলে মুশকিল। ফতুর না হলেও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে সে! আমরা তিন ভাইবোন তো ভালো জানতাম ওর বাবার কথা। আমাদের সবচে প্রিয় ছোট মামা বজলুর রহমান, এক অতি উদার, স্নেহকাতর মানুষটি। ধারকর্জ করে হলেও রাজকীয় স্টাইলে অতিথি আপ্যায়নে তাঁর জুড়ি মেলা ভার! এই তো ক'বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। দেশ সেবা আর জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগেই ছিল তাঁর আনন্দ। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, আমার মার প্রতি যেমন, আমার প্রতিও মামার আদর-সমাদর ছিল খুবই গভীর। ছেলেটাও পেয়েছে বাবার স্বভাব। কিন্তু আমরা সত্যি চাই না সে আমাদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত খরচ করতে থাকুক। আমাদের আর্থিক বুনিয়াদ তো এখনো বেশ শক্ত। তাছাড়া ও কী করছে, আর্থিক সঙ্গতি কি-রকম তা সঠিক জানা নেই। সন্ধ্যায় সে চমৎকার শুঁটকি ভর্তা, চিংড়ি, গোশত, ভাত নিয়ে চলে এলো সবার জন্য। পাগল ছেলে! মানা করলেও সে শুনবে না। যা জানা গেল, সে কোনো

চাকুরীতে নেই। মনে হলো, কোন ঠিকাদারের সহযোগী বা জোগানদার।

হুজুরসহ আছরের নামাজ পড়তে গেলাম। একটা প্রজাপতি বারবার উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। মাঝখানে আকাশের চাঁদোয়া। উন্মুক্ত। বৃষ্টির সময় নাকি স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ছাতা এসে হাজির হয়। নামাজের পর অনেক ঘুরপথে গিয়ে আঁ হজরতের রওজা মোবারক জেয়ারত করলাম। পরে মুরাদুল্লাহ-ভাই তাঁর অন্যতম দীর্ঘ মুনাজাত করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। তবে বক্তব্যে আদ্যোপান্ত রাসুলে খোদার উপস্থিতিসমৃদ্ধ। কখনোবা তিনি হলেন ক্রন্দনশীল - যা প্রভাবিত করলো আমাদের দলভুক্ত অনেককে।

হোটেল-কক্ষে এসে অল্প বিশ্রামের পর মাগরিব পড়তে গেলাম রব্বানী সাহেব ও আমি। ইশা পড়ে ফিরলাম। মেয়েদের কক্ষ ৩০৪ নম্বরে তখন খাওয়ার ধুম। নাসরীনকে নিয়ে আমি দেশে ফোন করতে বেরিয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে রাত বারোটা বেজে গেছে। দেশে তখন রাত নয়টা। আমার মেয়ে প্রসন্নাকে পাওয়া গেল। ওরা যমুনা সেতু দেখতে গিয়েছিলো এবং সেখানে এক গেস্ট হাউসে দু'রাত কাটিয়ে সদ্য ফিরেছে। বাচ্চারাসহ সবাই খুব খুশি। এতদূর থেকে আমাদেরও বড় আনন্দ হলো। মনে প্রশান্তি নিয়ে গিন্নীকে ওর কক্ষে পৌঁছে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। পাশে রব্বানী সাহেব ও মনিরুজ্জামান খান (ফারুক ভাই) মিষ্টিমধুর আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১২ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৩ মহররম, ১৪২৫

ভোরে রব্বানী সাহেব সহ নামাজ পড়তে গেলাম। আবিষ্কার করলাম ইন্দোনেশিয়দের বসার ও পানি সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা। ওরা আগেভাগে এসে বড় বড় পিলারগুলো দখল করে বসে। হেলান দিয়ে পবিত্রগ্রন্থ থেকে পাঠ করে। কখনো ছোট ছোট পাত্রে পানি নিয়ে নিজেদের বোতল পূর্ণ করে। ফিরে দু'জনে চা-পুরি খেয়ে নিলাম কাশ্মিরী রেস্তোরঁয়। তারপর ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে আবার একই রেস্তোরঁয় গেলাম নাসরীন ও বুলবুলকে নিয়ে। তারপর বিন দাউদের

দোকান। এখানে এটা মক্কা শরীফের থেকেও নিকটতর অথবা একই দূরত্বের। তৈয়ব নামে পটিয়ার কুসুমপুরার এক যুবক কিছু কেনাকাটায় সাহায্য করলেন। এই কুসুমপুরায় আমার বাবা ও চাচারা বাল্যকালে অবস্থান করেছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আব্দুর রহমান তখন পড়িয়েছেন তাঁদের। পরে তাঁকে মুসলিম হাই স্কুলে পাই আমার শিক্ষকরূপে। ...

আছর পড়ে ফেরার পথে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। রব্বানী সাহেব ও আমি ফিরছিলাম। পথে এক পোলারয়েড আরব ক্যামেরাধারীর পাল্লায় পড়ে একটু হেনস্তা হতে হলো। যাহোক, অল্প কথা কাটাকাটির ওপর দিয়ে গেল।

জান্নাতুল বাকীতে রসুলুল্লাহ (সা.)-এ সাহাবীদের কবর জেয়ারতে গেলাম। সেখানে বহু কবুতর আর তাদের খাওয়ানোর জন্য প্রচুর গম বিক্রির আয়োজন রয়েছে। কবরের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বা সুশৃঙ্খল বিন্যাস নেই। সাতকানিয়ার এক মৌলভী ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি চান মিঞা সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত মুসাফিরখানায় থাকেন। থাকা-খাওয়ার অবস্থা নাকি ভালোই।

মাগরিব ও ইশা পড়ে হোটেলে এসে পেলাম মোহাম্মদ আলীকে। ও নিয়ে গেল সেই হাবিব রেস্টুরেন্টে। ভাত, মাছ, তরকারী খেলাম। খাদ্যবস্তু খুব উন্নতমানের ছিল না। তবে পরিবেশ ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৩ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৪ মহররম, ১৪২৫

ভোরে নামাজ পড়তে গিয়ে একটা সমস্যা লক্ষ্য করলাম। পর্যাপ্ত নিদ্রা, মনে হয়, কারো হচ্ছে না। তারপর মসজিদে এসে অনেকেই এত খুক খুক কাশি দিচ্ছেন যে, তা শ্রুতিকটূ ঠেকে। বহুবারের মতো আজও দুইপাশে ইন্দোনেশিয় ও তুর্কী মুসল্লি পেলাম। কিছু সৌজন্যমূলক আলোচনা চলল।

রাত্রে মোহাম্মদ আলী আবার খাবার নিয়ে এলো। শুঁটকি ভর্তা, বেগুন দিয়ে ছুরি শুঁটকির তরকারি, চিংড়ি কারী আর গোশত ভুনা। আজ একটু জোরে-শোরে বকা দিলাম ওকে। কিন্তু ও নাছোড়বান্দা। বলে, 'আপনারা তো আমার ওখানে উঠলেন না। সামান্য সেবা গ্রহণে

এত আপত্তি কিসের?' আমার কিছু ময়লা কাপড়ও ধোয়ানোর জন্য নিয়ে গেল।

ইশার নামাজের আগে মসজিদে-নববীতে একটা বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রব্বানী সাহেব সহ ছিলাম। একসাথে জুতোর বাক্সে জুতো রেখে নামাজ পড়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কুমিল্লার এক ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো। তার বেতন ২৫০ + ১৫০ রিয়াল। মসজিদের সেবাকর্মে রয়েছে, মূলত ক্লিনার। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে বুঝলাম, ভিন্ন দিকে চলেছি। ওখানে আমার ভাই নাদির শাহ ও মনিরুজ্জামান খান সাহেবকে পেলাম। তারপর দলের আরো দু'জনকে দেখলাম। তাঁদের বললাম, সমস্যার কথা। সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঝ-বয়সী এক কর্মীর সাক্ষাৎ। তাঁকে বললাম, আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বন্ধুকে পাচ্ছি না। কী করি? নানা বিকল্প চিন্তা করা হলো। শেষে মনে পড়লো, ১৪৪৩ খিলানের কাছে ব্যাগ ও জুতো রেখেছি। একটু ঘোরাঘুরি করে পেয়ে গেলাম অন্বিষ্ট ব্যক্তি ও বস্তু।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৪ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৫ মহররম, ১৪২৫

ভোর ৩টা-৪টার দিকে উঠে পড়লাম। নামাজ-শেষে এক কাপ কফি ও নতুন ধরনের সিঙ্গারা (নিমকি জাতীয় বস্তুর ভেতর আলু ভর্তা) খেলাম। রুমে ফিরে প্রচণ্ড ঘুম। গিন্নী এসে উঠিয়ে মাংসের ঝোল দিয়ে নান খাওয়ালো। ফারুক ওরফে মনিরুজ্জামান খান সাহেব দিলেন একটি প্রমাণ সাইজের কলা।

মোহাম্মদ আলী এসে আমাদেরকে খেজুর মার্কেটে নিয়ে গেল। সেখানে আমাদের এলাকা রাঙ্গুনিয়ার এক দোকানদার পেয়ে গেলাম।

ফেরার পথে আমি সরাসরি মসজিদে চলে যাচ্ছিলাম জোহরের নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে। একটু সময় ছিল। এক মিশরীয় দোকানে এক কাপ কফি খেলাম। নামাজ-শেষে হোটেলের সামনে মোহাম্মদ আলীকে পেলাম। মহিলারা তখনও ফেরেন নি। দু'জনে কাশ্মিরী রেস্তোরঁয় চমৎকার খেলাম - চাউল আওর কড়াই গোশ্ত্! আছরের নামাজ পড়ে এসে উপহার পেলাম মনিরুজ্জামান খান সাহেবের স্বহস্তে তৈরি এক কাপ চা।

মাগরিবের নামাজ পড়ে হোটেলে ফিরলাম। সাধারণত ফেরা হয় না। আজ ফেরা হলো একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। ভালোভাবে তৈরি হয়ে ইশার নামাজের পর রিয়াজুল জান্নাতে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ার ইরাদা। বলা হয়ে থাকে যে, এতে বেহেশত লাভ অবশ্যম্ভাবী! এখানেই হজরত বেলাল আজান দিতেন। জায়গাটায় পৌঁছানো বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহজে হয়ে গেল নাদির শাহ ও মনিরুজ্জামান খানের পথপ্রদর্শনের কারণে। ওঁরা আরও একবার কি দু'বার ওখানে গেছেন। রব্বানী ও আমি এই প্রথমবার। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা! ভয়ানক ভিড়। কিন্তু পারলাম। খুব অল্প সময়ে, নিজেকে গুটিয়ে, কোন রকমে দু'রাকাত নামাজ পড়ে ফেললাম। এরপর যথাবিহিত রাসুলে খোদার (সা.) রওজা মোবারক জেয়ারত করে ফিরে এলাম। মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল।

খান ও রব্বানী সাহেবরা হোটেলে নির্ধারিত খাবার খেতেন। নাদির আর আমি কাশ্মিরী রেস্তোরঁয় গিয়ে চমৎকার কাবাব ও পালক-আলু খেলাম নান দিয়ে।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৫ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৬ মহররম, ১৪২৫

আবার এক অস্বস্তিকর রাত অতিবাহিত হলো। ভোরে নামাজ পড়ে এসে রানীর তৈরি চমৎকার এক কাপ চা খেলাম। তারপর ঘুমালাম। জেগে উঠে বিন দাউদের দোকানে অনেক খুঁজে-পাওয়া এক অসাধারণ টোস্ট বিস্কুট দিয়ে চা খাওয়ালাম সবাইকে। আবার কাশ্মিরী রেস্তোরঁয় নাশতা এবং বিন দাউদে কিছু বাজার। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় একটি সৌদী পত্রিকা ক্রয়। আমার এক আত্মীয় মেজর নুরুজ্জামান সাহেব মদিনায় ডা. হারুনুর রশীদের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। বহু বছর ধরে আছেন। সৌদী সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি বিশেষ নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। অবশেষে আজ তাঁর বাসায় ফোন করে খবর দিতে পারলাম।

জুমার নামাজে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করলাম। চিড়ে-চ্যাপ্টা অবস্থায় নামাজ পড়লাম।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৬ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৭ মহররম, ১৪২৫

সকাল সাড়ে সাতটায় আজ 'সাইট সিইং ট্যুরে' বেরুলাম। ওহুদ পর্বত, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমীর হামজা ও পঁচাত্তর জন সাহাবীর মাজার, কেবলাতাইন মসজিদ (এখানে রাসুলে খোদা (সা.) যখন নামাজ পড়ছিলেন তখন তাঁর কাছে ওহী এল যে 'জেরুসালেম নয়, কাবাকে কেবলা করে নামাজ পড়তে হবে'।), খন্দক, কুবা (মক্কা থেকে মদিনায় এসে এখানে প্রথম নামাজ পড়েছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)। প্রচলিত বিশ্বাস এখানে দু'রাকাত নামাজ পড়লে একটি ওমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়)।

সাড়ে দশটায় ফিরে এসে ডা. হারুনের হাসপাতালের অফিসে গেলাম। তাঁর পুরো নাম ডা. কাজী মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ। তাঁকে সৈয়দ আলী আহসানের *হে প্রভু, আমি উপস্থিত* বইটি উপহার দিলাম। তিনি আমাকে তাঁর লেখা *আত্মশুদ্ধির ক'টি পন্থা* (নতুন মাছায়েল সম্বলিত একাদশ সংস্করণ, ২০০২) বইটি দিলেন। বাদ আছর নয় জন সঙ্গী নিয়ে তাঁর বাসায় চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন।

যেতে হলো। খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করলাম। তাঁর বাগান দেখলাম। এক পুত্র ও স্ত্রী সহ বাসার সবাই অতিথি সৎকারে লেগে গেলেন। পরদিন রাত্রে তাঁর বাসায় আমরা ১০/১২ জন যেন নৈশভোজনে যাই সেজন্য খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অনেক কষ্টে, অবশ্যই কিছুটা অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে, এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে হলো। দু'পক্ষই মনোকষ্ট পেলাম নিঃসন্দেহে।

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ● ১৭ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৮ মহররম, ১৪২৫

হাজার হাজার নর-নারী পরিবৃত হয়ে ফজরের নামাজ পড়তে গেলাম। ফিরে এসে মনিরুজ্জামান খান (ফারুক ভাই), তাঁর স্ত্রী রানী, নাদির শাহ ও আমি কাশ্মিরী রেস্তোরঁয় প্রাতঃরাশ করলাম। পরে বিন দাউদ থেকে সংগ্রহ করলাম এক কপি *সৌদী গ্যাজেট*। জোহর, আছর কাটল ঘটনাবিহীন। কিন্তু তারপরই মুরাদুল্লাহ-ভাই আমাকে প্রতিশ্রুত *হিস্টরি অব মদিনাহ* গ্রন্থ হস্তান্তরিত করলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

মাগরিব ও ইশা পড়ে রিয়াজুল জান্নাত তথা হজরত বেলালের মিম্বর অভিমুখে চললাম ভেতরের কার্পেট-ঢাকা পথে। এবার খুব সহজে সুন্দরভাবে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লাম। এক অপরূপ হিল্লোলে দেহমন উদ্বেলিত হলো। তারপর এগিয়ে চললাম বাঁ পাশে অবস্থিত হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ও নবীজীর রওজা শরীফ জেয়ারতে।

নৈশ ভোজনের জন্য এলাম আবার সেই কাশ্মিরী হোটেলে। এবার আছি নাদির শাহ, মোহাম্মদ আলী ও আমি। মেনু নির্বাচিত করলাম কাবাব, কদু-কারী, ভাত ও রুটি। খুবই উত্তম খাবার।

আমার স্ত্রীর কক্ষে এসে প্রাথমিকভাবে দুটি সুটকেস গোছানোর কাজ শুরু হলো। এ বিষয়ে আমার মামাতো ভাইটি ভয়ানক দক্ষ। আমাদের বিশেষ তকলিফ পেতে হলো না।

১ মার্চ, ২০০৪ ● ১৮ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ৯ মহররম, ১৪২৫

সকাল থেকে একটা বিমর্ষ প্রশান্তি। আজ আমাদের শেষদিন মদিনায়, সোনার মদিনায়।

ঘুম একটু কম হলো অন্যদিনের সকালবেলার তুলনায়। রব্বানী সাহেব সহ চা-পুরি খেলাম। একটু বেলা হলে গেলাম বিন দাউদে। পত্রিকা ক্রয়। তারপর পছন্দসই একটা ইতালীয় আফটার শেভ কিট কিনলামছোট ছেলে পাপ্পুর জন্য। চারদিক দেখেশুনে ফিরছি। একটা ঘড়ির দোকানে বসে আছে দুই সাতকানিয়ার সন্তান - আইউব ও রাসেল। পরিচয় হতে না হতেই চা-পানের আমন্ত্রণ। আইউব তার ভাইয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে আমার উপদেশ ও সাহায্য কামনা করে।

স্ত্রীকে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত মহলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি আরেকটু এগিয়ে প্রবেশ করলাম মসজিদে-নববীতে। ফিরে স্ত্রীর দুপুরের খাবারে ভাগ বসালাম। অবশ্য আমি কিছু খেতেই চাইনি আজ, এ রকম মাঝে মাঝে অনশন-ধর্মঘটের অভ্যাস রয়েছে আমার। তবে সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাত্রের বেলায়। কিন্তু এবার কিছু খেতে গিয়ে ঠকিনি। হোটেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাবার সরবরাহকারীর মেনুতে ছিল আলুভর্তা, কৈ মাছ আর ডাল। রান্নাও বেশ ভাল।

দুপুরে কনিষ্ঠ পুত্র পাপ্পুর ফোন পেলাম। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠে যা জানলাম, তা হলো : কর্ডলেস ফোনটা খারাপ। ওর মোবাইলে আমার মেয়ে প্রসন্না ও দু'বছরের নাতনি প্রমা কথা বললো। নাতি রা'দ বাইরে।

আছর পড়লাম। মাগরিব পড়তে যাবার আগে মুরাদুল্লাহ-ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বিদায়ী জেয়ারত নিয়ে আলোচনা। ডা. হারুনের কথা তাঁকে বললাম। তিনি তাঁকে চেনেন। তবে তাঁর ধারণা ছিল, হারুন সাহেব মদিনায় নেই। আমি তাঁর কার্ড দিলাম। ডাক্তার সাহেবকে ফোন করেও পেলাম না।

ইশার নামাজের পর অনেকক্ষণ ধরে জেয়ারত ও দোওয়া-পাঠ। মোহাম্মদ আলী খুব চমৎকার খাদ্যবস্তু নিয়ে এসেছে : সীমের বিচি দিয়ে ছুরি শুঁটকি, ইলিশ মাছ ও গরুর গোশত। চমৎকার রান্না!

রাত দশটার দিকে একবার বেরিয়ে এক সেট কর্ডলেস ফোন কিনতে গেলাম সবাই মিলে। ওখানেও নাকি দু'নম্বরী জিনিস চলে আসে। দেশী একজন বিশেষজ্ঞ ঘড়ি ব্যবসায়ী রাসেলকে পাওয়া গেল। তাঁর সাহায্যে খাঁটি জাপানি বস্তুটি সাতষট্টি ডলারে ক্রয় করা হলো। আমার বিদেশী মুদ্রা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। নাসরীন তাঁর মানিব্যাগ বের করলো। এবার রুমে ফিরে চূড়ান্ত লাগেজ বাঁধাছাঁধায় লেগে গেল সবাই। আমি আমার হাতব্যাগটি গুছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

২ মার্চ, ২০০৪ ● ১৯ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ১০ মহররম, ১৪২৫

যথারীতি ঘুম ভেঙ্গে গেল ভোরে। মনে পড়ল মক্কানিবাসী এক বাঙালির সুপারিশ : চল্লিশ নয় একচল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন মদিনায়। তাই একচল্লিশতম ওয়াক্তের নামাজ পড়তে চললাম মসজিদে নববীতে। এই কাজটা অর্থাৎ চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ যে সেখানে সময়মত ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়তে পেরেছি, এটা পরম করুণাময়ের বিশেষ অনুগ্রহ। এই 'রিসুয়াল'টা ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নত নয়, তবে একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে হজ সেরে এসে আল্লাহর পরমপ্রিয় রসুল-বন্ধু হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর

জীবনের শেষ দিন অবধি অতিবাহিত করেছেন যে স্মৃতিময় পুণ্যভূমিতে তার অতি কাছাকাছি অবস্থান করে এই সাধারণ ধর্মকর্ম করতে পারলাম এটা তো আমার এবং দলভুক্ত সবার অশেষ সৌভাগ্য! কী অপার আনন্দ ও অপরিসীম বেদনা অনুভব করছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না! একটু পরে এই সব পেয়েছির দেশ ছেড়ে চলে যাব।

চা-পুরি খেয়ে বাসে ওঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। এ সময় মামাতো ভাই মোহাম্মদ আলী আবার এলো অনেক নাশতা নিয়ে। অনেক রাত্রে সে বাসায় ফিরেছে। তাকে হোটেলে থাকতে বলা হয়েছিল। থাকেনি।

ডা. হারুনুর রশীদ সাহেবকে ফোন করলাম। এবার তাঁকে পেলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। তিনি পুনর্বার মদিনায় এলে তাঁর বাসায় ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন।

মদিনা থেকে জেদ্দা যাবার পথে খুব গোলমাল করল বাস-ড্রাইভার। প্রথমে আমাদের মোয়াল্লেমের লোকের সঙ্গে এক প্রস্থ ঝগড়া করল। সে বোধহয় মিশরী, ক্লান্তপ্রাণ এক গাড়িচালক। মাঝখানে গাড়ি কখনো খুব জোরে, কখনো খুব আস্তে চালায়। এক পর্যায়ে গান শোনার আগ্রহ তীব্র হওয়াতে ক্যাসেটের ভল্যুম দেয় বাড়িয়ে। এক-একবার মনে হচ্ছিল আমরা বোধহয় আজ রাত্রে প্লেন ধরতে পারব না। আল্লাহর অশেষ কৃপায় বিকেল তিনটার মধ্যে জেদ্দা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু মালপত্র নিয়ে বাইরে বসে থাকতে হল। ফারুক ভাইয়ের ভাগনে মুজিবুর রহমান সাহেব এখানে এয়ারফোর্সে চাকুরী করেন। তিনি নাসরীন, নাদির, বুলবুল সহ ফারুক ও রানীকে নিয়ে জেদ্দা ঘুরিয়ে আনতে গেলেন। এদিকে আমার সময় কাটল নানা ঝুট-ঝামেলায়, বিমান বন্দরে বসে বসে প্রহর গণনায়। জমজমের পানির ক্যানগুলোতে বিশেষ প্লাস্টিক প্যাকেজিং করাতে হলো, প্রতিটি পাঁচ রিয়ালের বিনিময়ে। মালপত্র সরাতে হলো দু'দুবার। এ সময়ে আমাকে খুব সাহায্য করলো মোহাম্মদপুর নিবাসী আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হাজী রিন্টু।

আমার পুত্রবধূ চিত্রার মামা জাহিদ সাহেব এলেন অনেক খাবার-দাবার নিয়ে। একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর ফাস্টফুড। বিমান বন্দর ইমারতের প্রাঙ্গণে চাদর বিছিয়ে পিকনিক পার্টি হয়ে গেল একটা।

তিনি এবং মুজিবুর সাহেব অনেক সাহায্য করলেন আমাদের। সব অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটলো বোর্ডিং পাস হাতে আসাতে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এবার হাতে এলো 'জে' ক্লাসের পাস। আসলে আমার এখন 'ওয়াই' শ্রেণীতে ভ্রমণ করা খুব অসুবিধাজনক মনে হয়। এটা কোন বড়লোকামি নয়। শারীরিক এবং মানসিক দাবি। অন্যথায় বরং আমার ভ্রমণসূচি বাতিল করা বেহ্তর। সেবার, ২০০২ সালে ব্রিটিশ এয়ারে 'ওয়াই' ক্লাসে লন্ডন যাবার পথে কী কষ্টটাই না পেলাম! যাক, আপাতত আমার চার আত্মীয়-স্বজন পড়লেন বাঁদিকে আর আমরা দু'জন পড়লাম ডান দিকে। মাঝখানে রয়েছেন মুরাদুল্লাহ-ভাই ও অন্যান্যরা। আমার একটা ব্যাগ বেশি ফুলে যাওয়াতে ওপরে রাখা যাচ্ছিল না। পায়ের কাছে রাখলাম। অসুবিধা হচ্ছে দেখে মুরাদুল্লাহ-ভাই প্রস্তাব করলেন, ওঁর সামনে দিতে। তিনি আমার সুখ-সুবিধার ব্যাপারে এতো দৃষ্টি দেন, শেষমেষ আমাকেই অপ্রস্তুত হয়ে যেতে হয়! এই বিমান যাত্রায় এক পর্যায়ে তিনি বললেন, বিদায়ী জেয়ারতের পর তিনি স্বপ্ন দেখেছেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে হুজুরের রওজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী আশ্চর্য সুখস্বপ্ন!

৩ মার্চ, ২০০৪ ● ২০ ফাল্গুন, ১৪১০ ● ১১ মহররম, ১৪২৫

চমৎকার ফ্লাইট! অনর্থক লোকে বিমানের বদনাম করে। ঠিক সময়ে ছেড়ে ঠিক সময়ে বিমান ঢাকা অবতরণ করল। আর সে কী অসাধারণ অবতরণ ! বিদেশী পাইলটদের শেখা উচিত আমাদের বিমানচালকের কাছ থেকে। তবে বলতে হয়, একটা হালকা ডিনার বা ব্রেকফাস্ট যা আমাদের পরিবেশন করা হয়েছে তা খুব উন্নতমানের ছিল না, যদিও একেবারে খারাপও ছিল না। এ ব্যাপারে বিমান কর্তৃপক্ষের একটু চিন্তাভাবনা করা বা পয়সা খরচ করার ব্যাপারে কার্পণ্য না-করা বাঞ্ছনীয়।

এবার আরো আশ্চর্য হলাম লাগেজের জন্য কনভেয়ার বেল্টের কাছে দাঁড়িয়ে। আমার বাঁ-পাশে দেখি চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন আর ডান পাশে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এন্টিবায়োটিক ল্যাব-পরিচালক আতা-এ মওলা। অনেকটা বিদায়-পূর্ব সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তা হলো।

ইলিয়াস কাঞ্চনকে এক পর্যায়ে বললাম, আপনার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা হলো না অথচ একসময় আমি দেশে ও বিদেশে খুব সিনেমা দেখতাম। এ বিষয়ে পড়াশুনাও কিছু করেছি। তাছাড়া জহির রায়হান ছিলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু আর চিত্রজগতে হারিয়ে-যাওয়া সাহিত্যিক অধ্যাপক নূরউল আলম আমার সবচে' পুরনো এবং পরমপ্রিয় সুহৃদ। ইলিয়াস কাঞ্চন দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, আমি আগে কেন ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করি নি। আমি বললাম : 'আমরা আসলে এক 'স্পিরিচুয়াল কোয়েস্টে' (আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে) একত্র হয়েছিলাম। খুচরো 'কালচারাল টক' বেশি না হয়ে থাকলেই বা কী ! আশা করি, ভবিষ্যতে আবার কখনো সুযোগ ঘটবে।' প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে ফরাশি মনীষী অঁদ্রে মাল্‌রোর কথা বললাম। নিজে অবিশ্বাসী না হোক, অজ্ঞেয়বাদী হলেও তিনি নাকি বলে গেছেন, 'একুশ শতক হয় ধর্মের শতাব্দী হবে অথবা কিছুই হবে না।' ইলিয়াস কাঞ্চন খুশিমনে কথাটা গ্রহণ করলেন, মনে হলো। এ সময়ে আশাতিরিক্ত অল্প সময়ে লাগেজপত্র আসা শুরু হলো। অবাক কাণ্ড আর কী !

নাদির শাহর জন্য গাড়ি এসেছে ভিআইপি চ্যানেলে। ছোটভাই আকবর শাহ গাড়ি নিয়ে ভাগনে আরিফ সহ এসেছে বোন বুলবুলের জন্য। আমাদের জন্য কেউ কি নেই ? আছে, একটু পর আমার ছোট ছেলে পাপ্পুর সাক্ষাৎ মিললো। গাড়ি পার্কিং নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল বলে বিলম্ব। ফেরার পথে গুলশান এক নম্বরে ওর অফিসে নেমে গেল পাপ্পু। গাড়ি চালাচ্ছে নতুন ড্রাইভার খলিল। বাড়ি বরিশাল। বাসায় এসে পৌঁছুতে একটা বেজে গেল। নাতি রা'দ ও নাতনি প্রমাকে পেয়ে আমাদের আনন্দাশ্রু আর চেপে রাখা গেল না। আমরা দু'জন খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছি। বাসায় অন্যরাও উৎফুল্ল আর উদ্বেলিত। অন্যরা মানে কন্যা প্রসন্না আর দুই পুত্রবধূ রুম্পা ও চিত্রা, দুই গৃহপরিচারক সোহেল ও রুবেল। সারাটা দিন খুব চমৎকার কাটল। বিকেলে বন্ধুবর প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল ফোন করলো। ওকে শরিফা বেগমের কথা বললাম। তিনি একটা ছোট দল নিয়ে আমাদের পাশাপাশি ছিলেন। স্বনামখ্যাত প্রফেসর শমসের আলী ঐ দলে ছিলেন। তিনি আবার মিসেস আউয়ালের সহপাঠী এবং আমার

শ্বশুরের দেশের লোক। শরিফা বেগম আমার ফ্রেন্স কানেকশনের বন্ধু জুনেদ চৌধুরীর আত্মীয়া। আউয়াল, জুনেদ বছর তিনেক আগে ওই দলে ভিড়ে হজ সেরে এসেছে। বাংলাদেশে এভাবে আমরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ি। এ কারণেই বোধহয় বহু আগে কোন বঙ্গীয় কবি বলে গেছেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা !'

ঘরে ফেরার আনন্দই আলাদা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই ফোন করে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। মিরপুর থেকে আমার ছোট বোন লিলি ও ওর স্বামী সৈয়দ বদিউল আলম, পরে ফোন করলেন আমার কানাডীয় বন্ধু জোসেফ টি. ও' ক'নেল। জোসেফ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হোস্টেলে থাকছেন। কর্মরত রয়েছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগে।

উপসংহার

ইংরেজিতে লেখা মক্কার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে, হজ বা উমরাহ'র ভ্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে একজন মুসলমানের পক্ষে উইল লিখে যাওয়াটা 'মুসতাহাব'। অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য অনুশোচনা, ভুলপথে যেন পুনর্গমন না ঘটে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কারো ক্ষতি করলে তা পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। তীর্থযাত্রী অবশ্যই হালাল উপার্জনে হজ ও উমরাহ পালন করবেন এবং সৎ ও ভালো মানুষের সঙ্গে ভ্রমণ করবেন। করণীয় ধর্মাচার সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং কারো প্রতি অবিচার বা অন্যের বিরক্তি উৎপাদন না করা, পাপ, অশ্লীল কাজকর্মে লিপ্ত না হওয়া, সর্বোপরি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ না করা - এগুলোও তীর্থযাত্রীর অবশ্য কর্তব্য-কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

আলহামদুলিল্লাহ, উভয়েই আমরা সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়েছি বলে আমাদের ধারণা।

প্রায় বছর ঘুরে আসছে। সব দৃশ্য যেন ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভাসছে। ইতোমধ্যে পরিচিত অনেকেই হজে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। সৌভাগ্যবান তাঁরা! পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ লাভ করুন তাঁরা - এই কামনা। হজব্রত পালনের মধ্য দিয়ে আমরা কয়েক লক্ষ মুসলমান যে শুধু পঞ্চম স্তম্ভ পূরণ করলাম তা নয়, সার্বিকভাবে আমরা যেন মুসলমান হলাম! এই মুসলমান হবার পূর্বশর্তরূপে মনে হয় আমরা যেন যথার্থভাবে মানুষও হলাম। মুসলমান হতে হলে যে-কাউকে অবশ্যই মানবিক গুণাবলীতে বিভূষিত হতে হবে যেমন, তেমনি মানুষ হতে হলেও যে কাউকে মুসলমানত্বের তথা ইসলামের মৌল আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে, এমনকি আপন আপন বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে হলেও। ইসলাম যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি এক সমষ্টিগত মানবকল্যাণমূলক ধর্ম। এখানে আচার-প্রক্রিয়ায় অনেক কিছুই প্রতীকী/সিম্বলিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে এর ধারাবাহিকতা।

এই যে আমরা হজ সেরে এলাম, আমার বাবা-মা ১৯৭৪ সালে ভগ্নপ্রায় শরীর নিয়ে এবং অবাঞ্ছিত অর্থকষ্টের মধ্যেও প্রয়োজনীয় পুণ্যকর্মটি সমাধা করেছিলেন। আমার দাদা তাঁর প্রথম জীবনে বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় সে এলাকায় পড়াশুনা করেছেন, হজ করেছেন। আমার শ্বশুর একাধিকবার উমরাহ করেছেন। তাঁর আব্বা ১৯৫৪ সালে হজ সেরে এসেছিলেন। তাঁর দাদাও দীর্ঘকাল আরব-ইজিপ্টে থেকে হজব্রত পালন ও অধ্যয়ন করেছেন। আমাদের বহু আত্মীয়-স্বজন এভাবে হজে গেছেন, যাচ্ছেন ও যাবেন। এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আমাদের টানছে, আরব দেশে অগুনতি মানুষের মহামিলন ক্ষেত্রে। স্বভাবতই সে সুযোগ গ্রহণ করে আমরা ধন্য, আমরা কৃতজ্ঞ।

আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ, হারাম শরীফ তথা পবিত্র মসজিদে নামাজ আদায়, সাফা-মারওয়ায় সায়ী, মিনা-আরাফা-মুজতালিফায় অবস্থান ও প্রার্থনা, মসজিদে-নববীতে নামাজ পড়া ও রওজা-মোবারকে জেয়ারতের ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে বিশ্বের মুসলিম নর-নারী এখানে এসে উপস্থিত। পৃথিবীর আর কোথাও তো কখনো এতবড় ধর্মানুষ্ঠান হয় না।

সৌদী গ্যাজেট পত্রিকার ১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'ইসলাম' শীর্ষক পাতায় শিকাগো অবস্থানরত ডা. হাশাম এ. হাসসাবাল্লাহ 'হজ এ ইয়ার লেইটার' প্রবন্ধে যথার্থই লিখেছেন, 'মক্কার পবিত্র ধর্মকেন্দ্র কাবার সামনে যেভাবে প্রার্থনা করেছিলাম তা অন্য কোনো প্রার্থনার মতো ছিল না। মক্কার ধর্মানুষ্ঠান পূর্ণ করে মদিনায় অভিযাত্রা যেন বেশ মজাদার একটা ভোজপর্বের পর সবচে' 'ডেলিশাস্ ডেসার্ট' পাবার মতো। পরে রসুলের (রা.) রওজা পরিদর্শন, তাঁর মসজিদে প্রার্থনা, সর্বত্র তাঁর শীতল-কোমল উপস্থিতির অনুভব নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গে উজার করে দেয়ার মতো। অশ্রুসজল নয়নে তাঁকে জানানো হলো সশ্রদ্ধ অভিবাদন।'

ডা. হাশামের মতে, মক্কা যে পাথরের পাহাড়ের আর মরুভূমির পাশে অবস্থিত, কোনো সমুদ্র তীরে শান্ত বেলাভূমিতে নয় তারও কারণ আছে। এখানেই সম্ভব একান্তভাবে আল্লাহর উপাসনা ও কেবল তাঁরই স্মরণে আত্মোৎসর্গ।

তীর্থযাত্রীর জন্য যেমন আল্লাহর সুনজর রয়েছে তেমনি হজের দিন অর্থাৎ আরাফাত অবস্থানের দিন যারা হজ পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁদের জন্য একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। সেদিনটি যদি রোজা রাখা হয় তাহলে আল্লাহ বিগত বৎসরের গোনাহখাতার কথা বিস্মৃত হবেন। রমজান মাস ব্যতিরেকে রোজা পালন অসুবিধাজনক হলেও এই দিনটি তো আমরা এই পুরস্কার গ্রহণে প্রলোভিত হতে পারি।

মাইকেল উলফ তাঁর *দা হজ* গ্রন্থে লিখেছেন, আপনি মক্কা ছেড়ে আসছেন বটে কিন্তু মক্কা আপনাকে পেছন থেকে ডাকছে। ১৯৭৭ সালে ওমরাহ, ২০০৪ সালে হজ সেরে আসার পরও এখন নাসরীন ও আমি প্রায়ই ভাবছি এবং বলছি, আরেকবার হজে গেলে হয় না! না, তা আর হয় না। যা হবার হয়ে গেছে। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। তাছাড়া আর একজনের অসুবিধা সৃষ্টি করে আমরা দ্বিতীয়বার হজে যেতে চাই না।

মক্কায় রফিক সাহেব, মদিনায় কল্যাণীয় মোহাম্মদ আলী আর ডা. হারুন তো দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন সফরকালে তাঁদের সঙ্গে অবস্থানের। দেখি, আমরা এক রমজান মাসে পবিত্র শবে কদরকে উপলক্ষ্য করে উমরাহ পালনে যেতে পারি কিনা। ইনশাল্লাহ পারবো। ইচ্ছা থাকলে উপায় তো হয়ই। এবার যেমন হলো।

হজ সেরে এসে ক্রমে আরো অনেক যোগাযোগ ও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সবচে' বড় হয়ে দাঁড়াল এক অনবদ্য, পবিত্র ধর্মাচার যার বহির্প্রকাশ নামাজ পড়া। আগে মাঝে-মধ্যে কিংবা সকাল-সন্ধ্যায় প্রধানত নামাজ পড়া হতো। এখন তা হলো নিয়মিত। দৈনিক পাঁচবার। আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে আরো বেশি - ইশরাক, তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল। অর্থাৎ নামাজ এখন 'কায়েম' হয়ে গেল আর কি ! আলহামদুলিল্লাহ !

এখন চোখ বুজলেই চোখে ভাসে মক্কা-মদিনার ছবি। মনে পড়ে যেসব সঙ্গী-সাথী এই উনচল্লিশ দিনের তীর্থযাত্রায় নানাভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন তাঁদের কথা। সুতরাং কামনা করি তাঁদের সবার মঙ্গল ও সুস্বাস্থ্য।

বয়স ও কর্মের ক্লান্তি সত্ত্বেও নিজেকে মনে হচ্ছে হালকা-পাতলা, ছিমছাম। আজ আমার মনে পড়ছে মুহাম্মদ আসাদের কথা। আসাদ ছিলেন অস্ট্রিয়ার একজন ইহুদী সাংবাদিক। নাম - লেওপোল্ড ওয়েইস, যিনি পরে মুসলমান হয়ে যান। আমাদের প্রখ্যাত কথাশিল্পী শাহেদ আলী তাঁর *দা রোড টু মেক্কা* বইটি *মক্কার পথ* নামে অনুবাদ করেন। তাতে আছে :

"অতীতে আমি গোনাহখাতা এবং ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলাম না, কিন্তু হাফিজ কি বলেন নি :

'হে আল্লাহ, মধ্য সাগরে তুমি নিক্ষেপ করেছো একটি তক্তা। তুমি কি আশা করতে পারো তক্তাটি শুকনো থাকুক?'"

সৌদী আরব : এখন

সৌদী আরব বর্তমান বিশ্বে একটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশ। এখানে প্রতিষ্ঠিত এক অভিজাত রাজতন্ত্র। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রকাশ্যে সবাই এঁকে মান্যগণ্য করে থাকেন। অর্থবিত্ত, খনিজ সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তিতে এ দেশ তুলনাহীন। ফলে কোন না কোনভাবে সবাই এঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। বিশ্বের কয়েক শত কোটি মুসলমান ধর্মীয় কারণে জীবনে অন্তত একবার এ দেশ সফর করতে ব্যাকুল। 'এখানে দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক। এই নিয়মতান্ত্রিকতাই এ দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। ধর্মের অনুসরণ ও ধর্মীয় নির্দেশাবলী পালন এগুলোও দেশের আইনের আওতায় পড়ে।' (সৈয়দ আলী আহসান, *হে প্রভু আমি উপস্থিত*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা বিহীন।)

আইন এখানে কঠোরভাবে সক্রিয় এবং বিচার পদ্ধতি দ্রুত। প্রায় তাৎক্ষণিক, অযথা বিলম্বীকরণের সুযোগ দেওয়া হয় না। এর সুফল সর্বত্র লক্ষ্যযোগ্য। হাত কাটা, শিরচ্ছেদ প্রভৃতি কারণে বহুবিধ অপরাধ দমন করা সহজ হয়েছে অথবা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

এ বিষয়ে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমাদের ঘটেনি। পাঁচ সপ্তাহের কিছু বেশি সময় অবস্থানকালে, বিশেষ করে, অন্তত চার সপ্তাহ সেখানকার সংবাদপত্র পাঠের ফলে কিছু ঘটনা-বা তার ব্যাখ্যা আমাদের নজরে এসেছে, যা এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

১. হজ ব্যবস্থাপনা ও আইন শৃঙ্খলার বিষয়

প্রথমত লক্ষ্য করা যাক এই অতি জরুরি বিষয়টির প্রতি। লক্ষ লক্ষ হাজীর মধ্যে প্রায় সবাই একমত হবেন যে, সর্ব ব্যাপারে সৌদী সরকার ও জনগণ ছিলেন সদাশয় ও সহযোগিতাদানকারী। হারাম শরীফ ছাড়া অন্যত্র নিরাপত্তা বাহিনী প্রায় অদৃশ্যগোচর। অথচ আমাদের সামনে এর মধ্যে এমন কিছু কখনো ঘটেনি, যা কারো জন্য ক্ষতিকর বা দৃষ্টিকটূ। তবে কিছু গাড়িচালক ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের দোকানের ভূয়া সৌদী মালিক (বা 'কফিল') প্রতিপক্ষকে কখনো কখনো হেনস্তা করতে তৎপর বলে মনে হয়েছে।

মিনা-মুজদালিফায় বাথরুম, টয়লেটের ব্যাপারে সম্ভাব্য আরো কিছু উন্নততর ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে পারে।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মিনায় একবার অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সৌদী সরকার ২.৮ বিলিয়ন রিয়াল খরচ করে ৫৭,০০০ তাপানুকূল অগ্নিরোধক তাঁবু স্থাপন করেছেন।

দু'বছরের মধ্যে সুবিশাল দশ তলা ইমারত হতে যাচ্ছে ২.০৫ মিলিয়ন রিয়াল ব্যয়ে। মিনা আর তখন তাঁবুর শহর থাকবে না।

এবারে সংঘটিত জামারাতের দুর্ঘটনা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। এর জন্য নানা বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হবে। তবে উভয় পক্ষ অর্থাৎ তীর্থযাত্রী ও শান্তিরক্ষা বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকদের আরো সাবধানী ও সক্রিয় হতে হবে, যার কোন বিকল্প নেই।

দৈনিক *ইত্তেফাকের* ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সংখ্যায় বড় আকারে লাল কালিতে লেখা সংবাদ 'বাংলাদেশী ৮ জন সহ মিনায় পদপিষ্ট হয়ে ২৫১ হাজীর মৃত্যু'। ঘটনা হলো ১ ফেব্রুয়ারির। পাশে এএফপি পরিবেশিত 'মিনায় শয়তানকে উদ্দেশ্য করে হাজীদের কংকর নিক্ষেপের দৃশ্য' শিরোনামে একটি রঙিন ছবি রয়েছে। আর রয়েছে সাদা-কালোয় নিহত ২ জন মহিলা সহ ৬ জন বাঙালি হাজীর ছবি। অবশ্য আরো কিছু তথ্য রয়েছে। সৌদী হজমন্ত্রী জায়েদ মাদানী বলেছেন, মাত্র ২৭ মিনিটের এই দুর্ঘটনায় এতজন হাজী মারা যান! মৃতের সংখ্যা হয়তো আরো দু'চার জন বেশি হবে। তাছাড়া এ সময়ে বাংলাদেশের ৩২ জন হাজীর স্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটেছে।

'সৌদী গ্যাজেট'-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ব্রিটিশ হজ ডেলিগেশনের প্রধান লর্ড আদম প্যাটেল প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে কিছু তথ্য ও সুপারিশ রয়েছে। লর্ড আদম নেতৃত্ব দেন ৩,৫০৭ জন তীর্থযাত্রীর এক দলকে। তাঁর সঙ্গে ছিল ৬ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা, ডাক্তার, ২ জন কাউন্সিলার ও পররাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের ২ জন প্রতিনিধি। ঘটনাস্থলে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য তাঁরা কেউ আহত হননি। লর্ডের মতে, মুজদালিফা প্রত্যাগত হাজীরা কিছুতেই সরাসরি জামারাতে প্রবেশ করতে পারবে না। করলে দুর্ঘটনা ঘটবে। রাস্তা বন্ধ করে তাঁদের তাঁবুতে ফেরাতে হবে মিলিটারির সাহায্যে। সময় বেঁধে দিয়ে তাঁদের মিলিটারির দ্বারা শ্রেণীবদ্ধভাবে জামারাতে নিয়ে যেতে হবে। আশেপাশে কেউ শুয়ে থাকতে বা ক্যাম্প করতে কিংবা মাথামুণ্ডন করতে পারবে না। ঐ এলাকা যানবাহনের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। তিনি সৌদী হজমন্ত্রীর কাছে এসব সুপারিশ পেশ করেছেন। তাঁর মতে, সাধারণভাবে সৌদী কর্মকর্তারা তীর্থযাত্রীদের সসম্মানে চমৎকার সেবা দান করেছেন।

উল্লেখ্য যে, জামারাতে গত বছর মারা গেল ১৪ জন, আগের বছর ৩৮ জন এবং তার আগের বছর ১১৮ জন। এ বছরই মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। দুর্ঘটনাও ভয়ানক দুঃখজনক।

হাজীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা রূপে পাঁচ বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে। সৌদী নাগরিক ও সৌদী আরবে বসবাসকারী বিদেশীদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হজ করার ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে।

তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় উপপ্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুলতান এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বিদেশীদের ক্ষেত্রেও পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ যেন দ্বিতীয়বার হজ করতে না আসেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে (দ্র. *এরাব নিউজ*, ১২.২.২০০৪)। তাঁর মতে, আগামী বছর ও পরবর্তী বছরে পরিস্থিতি উন্নততর হবে। তাছাড়া, চূড়ান্ত বিরুদ্ধবাদী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যেমন তাঁরা কঠোর হস্তে দমন করবেন, তেমনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যেও কাজ করে যাবেন। পরবর্তী তিন বছরে তিন বিলিয়ন রিয়াল খরচ করে ৩০,০০০ তরুণ সৌদীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বেসরকারীকরণের ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে খুব শিগগির সৌদী এরাবিয়ান এয়ারলাইন্সও পড়বে।* উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে হজ পালন

সৌদী গ্যাজেট-এর ৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় *মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের* একটা সিম্পোজিয়ামের খবর রয়েছে সেখানে অংশগ্রহণকারীরা ঐ প্রতিষ্ঠানের মহাসচিবকে অনুরোধ জানাচ্ছেন : To convey their thanks and appreciation to the government of Saudi Arabia for its great efforts to facilitate the performance of the rituals so that the pilgrims can perform Haj in an atmosphere of peace, comfort and security.

তীর্থযাত্রীরা শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে যে হজব্রত পালন করতে সক্ষম হয়েছেন তার সুব্যবস্থার জন্য সৌদী সরকারকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছে। বলাবাহুল্য, আশেপাশে কিছু সমালোচনার গুঞ্জন শুনতে পাওয়া গেলেও আমি নিজে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও সন্তোষ প্রকাশ করে সৌদী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হামাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মানে-এর কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বয়স্ক বিশ লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রীর জন্য বিনামূল্যে যে সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন, তা তুলনাবিহীন এবং চমৎকার সেবার নিদর্শনরূপে বিতরিত। সেই মহান প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে সংস্থা। (*সৌদী গ্যাজেট*, ১৭-০২-২০০৪।)

এরাব নিউজ-এর ১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল যাতে খোদ হজ মন্ত্রণালয়কেই বেসরকারী করবার সুপারিশ করা হয়েছে।

মক্কা-মদিনায় খুতবা

কাবা মসজিদের ইমাম এবং খতিব ড. সৌদ বিন ইব্রাহিম আল-শুরাইম ৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার তাঁর খুতবা তথা ধর্মীয় ভাষণে বলেন, হজ হচ্ছে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো, তাঁর মহত্ত্ব প্রচার করা এবং একক অংশীদাররূপে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা আমাদের কর্তব্য। তীর্থযাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, কোরআনের নির্দেশ মেনে আপনারা আপনাদের পবিত্র ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেছেন, নানা অস্বস্তি, ভ্রমণক্লান্তি উপেক্ষা করেই এসব সমাপন করেছেন। তাশরিকের প্রথম দিনে পদপিষ্ট হয়ে ২৫১ জনের মৃত্যুর জন্য কিছু তীর্থযাত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসাবধানতাকেই তিনি দায়ী করেন। তবে তিনি উলেমা ও ইসলামিক ফিক-এর পণ্ডিতদের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা যেন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে আরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। অবশ্য একদল বিদ্বান ব্যক্তি যে সাফা-মারওয়া ১৪ বার ঘুরে আসার কথা বলেন তাঁরা ভুল নির্দেশ দেন। তাঁর মতে, নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং উমর বিন আল খাত্তাব (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) কালো পাথরে চুম্বন প্রদানের জন্য ধাক্কাধাক্কি না করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অন্যের প্রতি অসুবিধা সৃষ্টি না করেই এই কাজ করা সম্ভব। আর তা যদি সম্ভব না হয় দূর থেকে হাত তুলে তকবির দেওয়াই উত্তম। তিনি তীর্থযাত্রীদের হজ সমাপনের পর সব সময় ভাল কাজ করে যেতে এবং আন্তরিকভাবে কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে অনুরোধ জানান।

মদিনার মসজিদে নববীর ইমাম এবং খতিব শেখ সালাহ বিন মোহাম্মেদ আল-বেদাইর একই সুরে তাঁর ভাষণে বলেন যে, তীর্থযাত্রীরা যেন হজ সেরে কোনক্রমে পাপপূর্ণ, লজ্জাকর কাজে লিপ্ত না হন। তীর্থ হচ্ছে ভালো কাজের জন্য। তীর্থযাত্রী তাঁর স্বদেশে তাঁর নিজের লোকদের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ, যুক্তিগ্রাহ্য মন, মহানুভবতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি যদি এমন ভালো গুণাবলী নিয়ে ফেরেন তাহলেই তিনি হজ থেকে যথার্থ শিক্ষালাভ করলেন বলা যাবে। (*সৌদী গ্যাজেট*, ০৯-০২-২০০৪, পৃ. ৯।)

হাজীদের জন্য উপহার

হজের সময় পানি, কোমল পানীয়, আইসক্রিম, সলিড খাবার-দাবার, বইপুস্তক, ক্যাসেট, পোস্টার ইত্যাদি বহু কিছু হাজীদের বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। হজ মুয়াতামার গিফট নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এ কাজে তৎপর। তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে মিলে ১.৬ মিলিয়ন খাবার সরবরাহ করেন। তাঁরা ইংরেজি, ফরাশি, ইন্দোনেশিয়ান, তুর্কী, বাংলা, রুশ, ইয়োরুবা, হিস্পানী, আলবেনিয়ান এবং চীনা ভাষায় ইসলামী বই ও ক্যাসেট বিলি করে থাকেন। এই প্রকল্প এ বছরই প্রথম চালু হয়েছে বলে জানা গেছে। (*সৌদী গ্যাজেট*, ০৯-০২-২০০৪।)

আইন-শৃঙ্খলার কিছু বিষয়

পত্রিকায় একটি খবর পড়লাম শিশু বিক্রির। এক বর্মী দম্পতি - মোহাম্মদ ওয়ালী কাধেল (৩৫) ও তার স্ত্রী আমিনা আবুল হাসান (৩০) দশ হাজার রিয়ালের বিনিময়ে তাদের সন্তান বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। পরে তারা ক্রেতার কাছ থেকে আরো বেশি রিয়াল দাবি করে। মক্কার গভর্নর প্রিন্স আব্দুল আজিজ এর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

খাস মক্কায় এই ঘটনা ঘটতে পারল! তারপর ১৪ ফেব্রুয়ারি সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে বিদেশী তরুণরা মিনায় এক তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত বাংলাদেশীও ক'জন ছিল এর মধ্যে। কিন্তু কোন ফলোআপ খবরাদি আর দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমরা মক্কা থাকাকালে মদিনায়ও কিছু বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর পুনরুল্লেখ অবাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি দুষ্কৃতকারী, সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রধারী জঙ্গী বাহিনী সৌদী আরবে শান্তি ও শৃঙ্খলা ধ্বংস করতে তৎপর। একদিকে সরকার যেমন কঠোর হস্তে এগুলো দমন করতে চাইছেন, তেমনি দেশী-বিদেশী বন্ধুরা ভিন্ন ধরনের উপদেশও দিচ্ছেন।

সৌদী গ্যাজেট পত্রিকায় প্রায়ই একটি পৃষ্ঠায় বড় আকারে 'জাতির ধমনী' শীর্ষক একটি কলাম থাকে। সেখানে 'দেয়ালের লিখন' শীর্ষক একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছেন মাজেন আব্দুল রাজ্জাক বুলেলেহ। এটি *আল-ওয়াতান* আরবী পত্রিকা থেকে অনূদিত। বেশ ভাবগম্ভীর বক্তব্য। সম্প্রতি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সৌদী সমাজে সন্ত্রাস কবলিত পরিস্থিতির বিস্তৃতি প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য : এগুলোর কারণ নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যাবে - Because of our fanatic, closed discourse which stifles freedom of speech, causing things to backfire. (*The Saudi Gazette*, 29-02-2004)

সুতরাং সন্ত্রাস থেকে রেহাই পেতে হলে বিশেষত তরুণদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ মজ্জাগত হয়ে রয়েছে তা দূরীভূত করবার ক্ষেত্রে প্রয়াস গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এখানে আমরা যোগ করতে পারি অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের সুচিন্তিত মন্তব্য : 'একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশের মানুষকে সংশয়মুক্ত এবং অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে মুক্ত করা। সৌদী আরবে বিচার ব্যবস্থায় এই নীতি সর্বদা অনুসৃত হয়ে থাকে। মানুষে মানুষে মানবীয় সম্পর্কের যথার্থ বিকাশমানতার জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রয়োজন এবং গ্লানিমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন।' (*হে প্রভু আমি উপস্থিত ...*।)

২. সৌদী আরবে শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

অবিস্মরণীয় সে ক'দিনে পড়া কাগজ থেকে আরো কিছু বিষয়ভিত্তিক তথ্য তুলে ধরছি। অনুমান করছি আমাদের দেশে এগুলো সুপরিচিত নয়। প্রথমে ধরা যাক কিসওয়া অর্থাৎ কাবার গিলাফ প্রসঙ্গ।

কিসওয়া

কাবা গাত্রে রেশম ও উল মিশ্রিত আচ্ছাদন, যার আরবী নাম কিসওয়া। প্রতি বছর এটি বদলানো হয়।

অষ্টম হিজরীতে বিজয়ী বেশে মক্কাহ-আল-মুকারাম্মাহ প্রবেশকালে রাসুলে খোদা (সা.) কাবায় পূর্বের পোশাক রেখে দিয়েছিলেন কিন্তু এক দুর্ঘটনায় সেটা পুড়ে যায়। তখন ইয়ামেনী কাপড় দিয়ে তিনি তা বদলে দেন।

প্রথম তিন খলিফাও তাই করেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় কিসওয়া বদলাতে পারেননি। এরপর বছরের পর বছর একটির ওপর আরেকটি পোশাক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল কাবার গাত্রদেহে। পরে আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদি এক একবার শুধু একটি পোশাক পরানোর রীতি প্রচলন করেন, যা আজও বিদ্যমান। সৌদী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আজিজ আল-সৌদ এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মক্কায় একটা কারখানা প্রতিষ্ঠা করালেন ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে। এর কারিগর সবাই সৌদী। ১৯৭২ সালে এর জন্য একটা নতুন কারখানা নির্মিত হলো। এই আচ্ছাদনটি ১৪ মিটার উঁচু। উপরের এক-তৃতীয়াংশ এর বেল্টরূপে কাজ করে। এটি ৯৫ সেন্টিমিটার প্রশস্ত, দৈর্ঘ্য ৪৭ মিটার, লম্বা ১৬ অংশে বিভক্ত, যার মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত রূপোর সুতো দিয়ে কোরআনের বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। বেল্টের নীচ দিকে কোণায় 'সুরা ইখলাস' অতি মনোরম 'আল বুলুখ' লিখন শৈলীতে সেলাইকৃত।

কাবার দরজার জন্যও রয়েছে একটা পর্দা। আল-বুরজ নামের এই অংশটিও কালো সিল্কের তৈরি। এতে কিছু কোরআনের বাণী খচিত। সমস্ত কিসওয়ার জন্য খরচ হয়েছে ১৭ মিলিয়ন সৌদী রিয়াল। কিন্তু এটি বাদশাহর উপহার এবং তাঁর প্রার্থনা শুধু আল্লাহর পুরস্কার। (*সৌদী গ্যাজেট*, ৮ ফেব্রুয়ারি।)

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন দশক যাবৎ সৌদী আরব খুবই তৎপর। সত্তরের দশকে মক্কায় প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনও সেখানে শিক্ষক ছিলেন। অবসরগ্রহণের পরও অধ্যাপক আশরাফ দীর্ঘদিন সৌদী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার উচ্চ শিখরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ক্যাম্ব্রিজে এম.ফিল/পিএইচডি গবেষণায় কো-সুপারভাইজার বা সহায়তাদানকারী রূপে নিয়োজিত ছিলেন।

সৌদী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নির্বাচন

২৮ ফেব্রুয়ারির *সৌদী গ্যাজেট* পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় দাম্মাম ডেটলাইনে একটি খবর পরিবেশিত হয় যে, আগামী দু'বছরের মধ্যে ব্যাপক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় প্রধান, অনুষদসমূহের ডীন এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হবে। *আল-ইয়াউম* পত্রিকা আগের দিন এ সংবাদ প্রকাশ করে উচ্চতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ কাজ শুরু হবে যুবরাজ আবদুল্লাহর সংস্কার নীতিমালার অধীনে। শুরা কাউন্সিল এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংলাপ-এর সুপারিশক্রমে। সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন, পৌর কাউন্সিল-এর আংশিক নির্বাচন। এরপর হবে শুরা কাউন্সিল ও আঞ্চলিক কাউন্সিলের নির্বাচন। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিক অবধি এ ধরনের নির্বাচন সৌদী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত ছিল।

শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষা সংস্কারের অংশরূপে নতুন কারিকুলাম প্রবর্তিত করেছেন সৌদী সরকার। এতে বিতর্কমূলক অধ্যায়গুলো সংশোধিত হচ্ছে। রিয়াদে অনুষ্ঠিত সুইস শিক্ষা মেলায় ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী ড. খালেদ আল-আওয়াদ বলেন, একটি বড় প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে শীঘ্রই সমাজবিজ্ঞান, গণিত, বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন বইপত্র প্রকাশনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। বহুবিধ কারণে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যেমন দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাব। এই প্রক্রিয়ায় ৪ লক্ষ শিক্ষক নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সৌদী সরকার বিগত ২৫ বৎসরে ২৪০ বিলিয়ন সৌদী রিয়াল ব্যয় করেছেন, যা বিশ্বে সর্বাধিকদের অন্যতম। সৌদী আরবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছে বাজেটের ৯ শতাংশ, সেখানে বিশ্বের অন্যত্র দেশসমূহের গড় হবে ৫.০৮। (*এরাব নিউজ*, ০৫-০২-২০০৪।)

ইয়েমেনের সঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চুক্তি

১৭ ফেব্রুয়ারি ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ সালেহ সৌদী আরব সফরে আসছেন। তার আগে উক্ত বিষয়ে চুক্তি তৈরি হয়েছে। তবে সমস্যা দেখা দিচ্ছে সৌদী কর্তৃপক্ষ যে একটি ৪২ কি.মি. দীর্ঘ 'সিমেন্টের পাইপ লাইন' নামে ব্যাখ্যাত সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ করছেন তার জন্য। স্বভাবতই ইয়েমেন প্রতিবাদমুখর। পরে সৌদী ডেপুটি ইনটেরিয়র মিনিস্টার প্রিন্স আহমেদ বিন আব্দুল আজিজ বলেন, প্রাচীর হচ্ছে না। যা হচ্ছে তা হলো বালির বাঁধ (Sand dikes)। এতে দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষা হবে এবং স্মাগলিং ও ইনফিলট্রেশন বাধাগ্রস্ত হবে। (*এরাব নিউজ*, ১০-০২-২০০৪, *সৌদী গ্যাজেট*, ২১-০২-২০০৪/২৭-০২-২০০৪।)

মদিনায় কোরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স

এই পবিত্র গ্রন্থের অনেক আয়াত রাসুলে খোদা (সা.)-র কাছে মদিনাহ্ আল মুনাওয়ারাহ-তে অবতীর্ণ হয়েছে এবং চার খলিফা আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাঁদের প্রতি সদয় থাকুন) অতি আগ্রহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বাণীসমূহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এর কয়েকটি কপি তৈরি করা হয় কঠোর ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে। তৃতীয় খলিফার আমলে অন্য সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং শুধুমাত্র স্বীকৃত কপিগুলো ইসলামী দেশসমূহে পাঠানো হয়।

সেই থেকে আল্লাহর কিতাব নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত - বর্ণাশুদ্ধি, উচ্চারণ ও সংযোজন এড়িয়ে মূলগ্রন্থ রূপে প্রচলিত। যদিও দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়ে থাকে কিন্তু তা কোরআনের মর্যাদার উপযুক্ত হয় না অনেক সময়। এতে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ একটি অতি উচ্চ প্রায়োগিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রণ কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে অবিকৃত এবং উচ্চাঙ্গের প্রকাশনা রূপে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে এগুলো বিতরিত হতে পারে। এর জন্য বলাবাহুল্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত হয়েছে মদিনায়। ১৬ মহরম ১৪০৩ (১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। দু'বছরের মধ্যে এটি প্রকাশনা পর্যায়ে উপনীত হয়।

পৃথিবীর অন্যত্র প্রকাশিত কোরআন সংগ্রহ করে এখানে সবচে নির্ভুল, ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রকাশনার ওপর যেমন জোর দেয়া হয়েছে তেমনি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও কোরআন তেলাওয়াতের বাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। কোরআন এবং হাদীসের ওপর গবেষণা কার্য পরিচালনাও এই কমপ্লেক্সের কর্মপরিধির আওতাভুক্ত। কমপ্লেক্সের আয়তন ২৫,০০০ বর্গ মিটার। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৫,০০,০০০,০০ বিভিন্ন ধরনের কপি ও ক্যাসেট তৈরি হয়েছে। (*সৌদী গ্যাজেট*, ০৯-০২-২০০৪।)

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

সংবাদপত্র *এরাব নিউজ*, *আশরাফ আল-আওসাৎ*, *আল একতিসাদিয়া* ও অন্যান্য প্রকাশনার প্রতিষ্ঠান সৌদী রিসার্চ এন্ড পাবলিশিং কমপ্লেক্স-এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন ড. আজম এম. আল-দাখিল (Dr. Azzam M. Al-Dakhil)। (*Arab News*, 11-02-2004)

ফয়সল পুরস্কার

এরাব নিউজ-এর একটি বড় খবর হলো আল-দাহাব পেলেন ফয়সল পুরস্কার। সুদানের ফিল্ড মার্শাল আব্দুল রহমান সোয়ার আল-দাহাব ইসলাম সেবার কারণে এটি পেলেন। সুপ্রিম দাওয়া কমিটির সভাপতি প্রিন্স সুলতান এই

পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছেন, আল-দাহাব আরব ও ইসলাম বিশ্বে তাঁর মহান কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ।

এই পুরস্কার প্রথম পেয়েছিলেন সৈয়দ আব্দুল আলা আল মাওদুদী (পাকিস্তান, ১৯৭৯), ২০০৩ সনে প্রিন্স সুলতান দাউদ প্রতিষ্ঠান এটি লাভ করে। আল-দাহাব স্বদেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিমখানা প্রভৃতি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত আছেন। (*Arab News*, 11.02.2004)

লেখক মুনীফের ইন্তেকাল

সৌদী গ্যাজেট পত্রিকার ১১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ফাতেনা আমিন শাকের নাম্নী একজন লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীফ তথা আব্দুল রহমান মুনীফ সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। মুনীফ (আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত, ভীষণ সুন্দর প্রভৃতি) সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর *The Eastern Mediterranean* গ্রন্থ হলো সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নারীর স্থান বিষয়ে পর্যালোচনা। মুনীফের মহাকাব্যিক উপন্যাস হলো *The Cities of Salt (Part I The Desolation)*। এতে মুনীফের মানবিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মহত্ব সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে। কল্পনা ও বাস্তবতার সীমারেখা নির্ধারণ খুবই কষ্টকর এই রচনাসমূহে। নৃতাত্ত্বিক প্রসারতা এর অন্যতম গুণ। খুবই অন্ত র্দৃষ্টিসম্পন্ন এই প্রয়াত লেখকের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কোন কোন দিকে মিল আছে কিনা অদূর ভবিষ্যতে কেউ হয়তো অনুসন্ধান করবেন, এই প্রত্যাশা।

সম্মেলন ও কর্মশিবির

ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত সম্মেলনে সৌদী অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি সংবাদ *এরাব নিউজ*-এর ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। - ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ তারিখ থেকে জাকার্তায় অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে বিশ্বের ৩০০ পণ্ডিত যোগদান করবেন। ওআইসি'র সহযোগিতায় এই সম্মেলনে স্বনির্ভর ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় বিরোধ নিষ্পত্তি, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মান বৃদ্ধির প্রয়াসে ইন্দোনেশিয়া তার ১৭০ মিলিয়ন মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমাদের সঙ্গে দূরত্ব বিলোপ করতে চায়। 'ইসলাম মানবতার আশীর্বাদ' শীর্ষক এই সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রী বৃহত্তর সমঝোতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একটি যৌথ পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন। সৌদী পণ্ডিতদের মধ্যে দু'জন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। অন্যান্যরা ধর্ম, যোগাযোগ, শান্তি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করবেন। ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাহদাতুল উলেমা (সদস্য সংখ্যা ৪০ মিলিয়ন) সে দেশের সরকারের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করছেন।

উপসাগরীয় সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

সৌদী আরব, ইউএই, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার এবং ওমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো রিয়াদের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম সাংস্কৃতিক সপ্তাহে যোগদান করেছে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই সপ্তাহ উদ্বোধন করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী খালেদা-আল-আংকারি। তিনি একই সঙ্গে এই এলাকার শিল্পীদের 'ফরমেটিভ ড্রয়িং'-এর একটি প্রদর্শনীও উদ্বোধন করেন। এখানকার সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে কার্যকলাপের পরিচিতি পাওয়া যাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানমালায়। (*সৌদী গ্যাজেট*, ২৯-০২-২০০৪।)

টেলিকম কনফারেন্স

২৯ ফেব্রুয়ারি রিয়াদ গভর্নর প্রিন্স সালমান ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। সৌদী টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট খালিদ আল-মুলহিম এ প্রসঙ্গে বেসরকারীকরণের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় মানব কৌশল উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

কিং আব্দুল আজিজ মেডিকেল সিটিতে সত্বর *প্রস্থেটিক হার্ট ইমপ্ল্যান্ট ইউনিট* প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে ২ মিলিয়ন রিয়াল খরচ হবে। কার্ডিয়াক বিভাগের পরিচালক হানি নাজমের মতে এই এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এই ইউনিটে দুর্বল হার্ট রোগীদের জন্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থা হবে।

প্রিন্স তুর্কী বিন নাসের বিন আব্দুল আজিজ প্রেসিডেন্ট, আবহাওয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এজেন্সি এখন কুয়ালালামপুরে। *কনভেনশন অন বায়োলজিকেল ডাইভারসিটিজ*-এর ৭ম অধিবেশনে তিনি সৌদী আরব প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। (১৭-০২-২০০৪।)

পরিবেশ

'পরিবেশ সম্পর্কে কোরআন' একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন কারেম এস. খোনেইম। তিনি কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর মতে, আল্লাহ মানুষের জন্য উপযুক্তভাবে সব দিয়েছেন কিন্তু মানুষ নিজের নাক কেটে পরের নয়, নিজেরই যাত্রাভঙ্গ করেছে। স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। ভূমি ও সমুদ্রের ওপর করা হয়েছে অনেক অত্যাচার। ইসলাম এবং তার উম্মাহ মধ্যপন্থী। মুসলমান এবং বিশ্বের বস্তুসমূহের সঙ্গে সুসম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে সহাবস্থান করবে। প্রকৃতি ও প্রাণীসমূহের সৌন্দর্য-রক্ষা নীতিবোধের সপক্ষে এবং প্রগতি বা সভ্যতা বিস্তারের জন্য অপরিহার্য। (*সৌদী গ্যাজেট*, ১৭-০২-২০০৪।)

একই সংখ্যায় 'বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন ইমাম শাবির আলী। লেখকের মতে, কেবল বোঝাপড়া ও শিক্ষা মানুষকে এই অভিশাপ থেকে রেহাই দিতে পারে। কোরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে আমরা যেমন ফুলের প্রতিটি রঙ ভালোবাসি, তেমনি প্রতি বর্ণের মানুষের প্রতি থাকবে আমাদের মমত্ববোধ। আমাদের মসজিদে রাজপ্রজা, শাদা-কালো একই সমান।

সৌদী আরবে বেকার

বেকার সমস্যা শুধু স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে নয়, সবচে' বেশি উন্নত দেশগুলোরও শিরপীড়ার কারণ। সৌদী আরবেও তার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। তার জন্য সামরিক বাহিনী পর্যন্ত তৎপর রয়েছে। তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানসমূহে বছরে ১০,০০০ প্রশিক্ষণার্থীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বছর ২,৪৬৮ জন ভর্তি হয়েছেন, যাঁরা প্রত্যেকে প্রথম ৬ মাস ৬০০ এবং পরের ৬ মাস ৮০০ রিয়াল বৃত্তি পাবেন। এদের মধ্যে ২৫%-কে ১ বছরের ডিপ্লোমা করার সুযোগ দেওয়া হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র নেওয়া হলেও পরে প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় সমাপ্ত করতে অপারগদের মধ্য থেকে ১৯টি ইনস্টিটিউটে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। (*সৌদী গ্যাজেট*, ১৭-০২-২০০৪।)

হজ ও উমরাহ-বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক

হজমন্ত্রী ইয়াদ মাদানী সম্প্রতি তীর্থ ও গণমাধ্যম সম্পর্কিত একটি সিম্পোজিয়ামে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সৌদী আরব হলো ইসলামের সূতিকাগার। ইসলামের পবিত্রতম তীর্থকেন্দ্রগুলো এখানে অবস্থিত। অথচ হজ ও উমরাহ সম্পর্কে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন কোনো সাংবাদিক এখানে নেই। এজন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু এবং বছরের সেরা সাংবাদিকতা কাজের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। (*এরাব নিউজ*, ১৫-০২-২০০৪।)

নারী প্রসঙ্গ

রানী হওয়া সহজ নয়

এই শিরোনামে জর্ডানের রানীর সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে সৌদী গ্যাজেটের ২৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। বইটির নাম : *Leap of Faith,* Memoirs of an unexpected life, Queen Noor Al-Hussein of Jordan.

অনেকেই স্বপ্ন দেখেন যে জীবনে রানী হবেন। বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারিণী হবেন। অনেকের ক্ষেত্রে সেটা স্বপ্নই থাকে কিন্তু লিসা হালাবির জীবনে তা বাস্তবে

পরিণত হয়েছিল। বিশ বছরের বেশি সময় এই মার্কিন মেয়ে বাবা বিমান বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে জর্ডানের রাজপুত্রের অর্ধাঙ্গিনীতে পরিণত হয়েছিলেন। বাদশাহ হোসেইন পরে ক্যান্সারে মারা যান। রানী নূরকে সেজন্য খুব বিষাদক্লিষ্ট মনে হয় না। কেননা তাঁর বিশ্বাস মৃত্যুর পর তাঁরা আবার একত্র হবেন। রানীর জীবন পদ্ধতি যে কতো কঠোর তা বইটি পড়ার পর জেনে অনেকেই আর রানী হতে চাইবেন না বলে সমালোচকের ধারণা। বইটির মূল্য ৪৮ রিয়াল।

পরিবার ও নারী

মুসলিম পরিবার ও নারী সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জেদ্দাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান The International Muslim Organisation for Women and Family (IMOWF) যা Muslim World League-এর অংশ। তবে উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ডে বিশ্বব্যাপী কার্যপরিধির বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীন। এর মহাসচিব বাহিজা এজে (Bahija Ezee) বলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান এখন জনসংযোগ ও প্রকল্প গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছেন। এজের মতে, পশ্চিমা নীতি যেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে প্রতিষ্ঠিত ইসলামই সেখানে একমাত্র পদ্ধতি যা পরিবারনির্ভর।

২০০৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে 'মুসলিম নারী - আধুনিকায়নে তাঁদের দায়িত্ব ঃ সমাজভিত্তিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এবং কৌশল নির্ধারণ' থাকবে এর মূল বক্তব্য। পরিবার ও নারীর কর্মক্ষমতা বিকাশের ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল সাইয়েদা আয়শা ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। তাছাড়া আল সাইয়েদা খাদিজাহ অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা প্রাথমিকভাবে ৫০ মিলিয়ন সৌদী রিয়াল সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছেন। চিন্তায় ও বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠান মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে অবদান রাখতে আগ্রহী। (*Arab News*, 12-02-2004)

মহিলা ব্যবসা-উদ্যোক্তা

দাম্মামে 'ইস্টার্ন প্রভিন্স চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র ২০ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্যা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই কমিটি বিশেষ সহায়তা প্রদান করবেন। চেম্বার সভাপতি আব্দুল রহমান আল রশিদের মতে এতে সৌদী আরবে ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে থাকার পরিচয় বহন করে। এই উন্নয়ন ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সৌদী সরকার নারী সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য গভীরভাবে কাজে লিপ্ত। উক্ত কমিটির দুই সদস্য জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের অবদান এবং মহিলাদের অগ্রগতি সম্পর্কে ড. আয়শা আল মানা ও ড. আমাল আল তাইমি এই প্রগতিশীল সিদ্ধান্তের বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। (*Arab News*, 12-02-2004)

আইন পেশায় মহিলা

আম্মান শহরে তিন দিনের এক কর্মশিবির হয়েছে - আইন পেশায় মধ্যপ্রাচ্যের মহিলাদের ভূমিকার উন্নয়ন বিশেষ করে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীভূত করণের ক্ষেত্রে ১৫টি আরব দেশ ছাড়া ফিলিস্তিন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ তারিখে শুরু হওয়া এই কর্মশিবিরে চারটি বিষয় প্রাধান্য পায় : আইন ব্যবস্থায় নারী, আঞ্চলিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসের প্রয়োগ, মানবাধিকার ও সমতা এবং পেশাগত উন্নয়ন ও কৌশল প্রশিক্ষণ। জর্দানে ১৯ জন বিচারক, ১০৫০ জন আইনজীবী নারী রয়েছেন ৬,০০০ পুরুষ পেশাজীবীর মধ্যে। বর্তমান বাহশাহ নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে আগ্রহী। ১৯৯৯ সালে সিংহাসনে আরোহণের পর এ পর্যন্ত তিনি ১১০ সদস্যের নিম্নপরিষদে ৬ জন নারী আসন, ৫৫ সদস্যের উচ্চপরিষদে ৭ জন মহিলা, ২১ জনের মন্ত্রীপরিষদে ৩ জন মহিলা নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। (*সৌদী গ্যাজেট*, ১৭-০২-২০০৪।)

হিজাব ও নারী প্রগতি

ফরাশি সংসদ-সদস্যরা হিজাবের বিরুদ্ধে আইন পাশ করলে তা নিয়ে সৌদী পত্র-পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর পক্ষে ৪৯৪ এবং বিপক্ষে ৩৬ ভোটে এটি পাশ হয়। এতে মুসলমান ও ইহুদী স্কুল ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে অসুবিধায় পড়বে।

আমজাদ রাসামি-র একটি কার্টুন খুব চমৎকার ঃ ইউরোপীয় পোশাকে দুই বাহু ও হাঁটুর নিম্নভাগ নগ্ন রেখে শিরস্ত্রাণরূপে হিজাব এবং বুকে বড় ক্রুশ ধারণ করে এক বয়স্কা মহিলা আয়না দেখছেন। পাশে লেখা "Politically in Correct French fashion" (*এরাব নিউজ*, ১১-০২-২০০৪)

এ ছাড়া লক্ষ্য করা যায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ : প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের জন্ম হয়েছে সাম্য ভ্রাতৃত্ব স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। এখন যে রাষ্ট্রের দৃশ্যত পবিত্র ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার প্রয়াস সেখানকার আইনপ্রণেতারা করলেন তাতে মুসলমান বিদ্যালয় গামিনীদের শিরস্ত্রাণ পরা নিষিদ্ধ হলো আর স্বাধীনতার নীতিবোধকে অস্বীকার করা হলো। ভ্রাতৃত্ববোধকে ঠাট্টা করা হলো। সাম্য চেতনাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এই ফাসীবাদী এবং আপত্তিকর নিষেধাজ্ঞা সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ-সদস্যরা আরোপ করলেন তাতে মুক্তচিন্তা ও সহনশীলতার জন্য গর্বিত একটি দেশের সম্পর্কে কী ধারণা মানুষের হতে পারে? এই প্রশ্নের সমাধান একমাত্র ইউরোপীয় মানবাধিকার বিচারালয়ে আপীল করে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। (*এরাব নিউজ*, ১২-০২-২০০৪)

২০-২৩ ফেব্রুয়ারি তিনদিন রিয়াদ ঘুরে গেলেন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ফরাশি প্রতিনিধিদল। তাঁদের ধারণা, সৌদী সরকার ক্রমশ নানা সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু মহিলাদের মোটর চালনার ক্ষেত্রে খুব সত্বর অনুমতি মিলবে না। এ ব্যাপারে সংসদ-সদস্য অঁতোয়ান কারে যুবরাজ আব্দুল্লাহকে জানিয়েছিলেন যে, এতে সারা বিশ্বে সৌদী আরবের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতো। কিন্তু মহামান্য যুবরাজ বলেছেন যে, এটা সমাজ বিবর্তনের প্রশ্ন। একদিন ওঁরা নিশ্চয়ই গাড়ি চালাতে সক্ষম হবেন। তবে তা এত তাড়াতাড়ি নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য সংস্কারে সৌদী সরকার অবশ্যই আগ্রহী। যুবরাজ একমত হন যে এই বছরে ১২০ সদস্যের শুরা কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতে যাচ্ছে এবং দুই বছরের মধ্যে আঞ্চলিক কাউন্সিলের অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া দু'পক্ষ একমত হন যে, ইরাকে দ্রুত নির্বাচন হওয়া অনুচিত। ইরাকী জনগণ বাইরের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ফিলিস্তিনের ব্যাপারেও তাঁরা ইসরায়েলি প্রাচীর নির্মাণের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ইসরায়েল ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা উচিত।

যুবরাজ আব্দুল্লাহ ফরাশি সরকারের হিজাব সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে মনোযোগের সঙ্গে শোনেন এবং মুসলিম মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদল জানান, এই নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র বিদ্যালয়েই প্রযোজ্য, বাইরে নয়। কারণ রাজনীতি এবং ধর্মীয় দিক থেকে এটি হলো নিরপেক্ষ এলাকা। (*সৌদী গ্যাজেট*, ২৫-০২-২০০৪)

সৌদী গ্যাজেট ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় তার বিশেষ পাতা 'পালস অব দা নেশন'-এ সম্পূর্ণ নাহেদ বাশাতাহ-র আরবী থেকে অনূদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম 'দা রোল অব উইমেন ইন দেয়ার রনেসঁস : প্যারটস ইন লায়ন্স ডেন'। বক্তব্য কিছুটা অস্পষ্ট হলেও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার তিনি প্রবক্তা। এখানে ক'টি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

Islam is a strong religion that has endured for thousands of years, and therefore does not need our protection as much as we need to express it through our reality and on way of life, for it is a religion of life. ...

A writer is supposed to establish a culture of tolerance in his or her society, not to promote violence towards others. ...

Islam has given us a great image which we can see only when the fog of fallacy clears.

মহিলা বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে এই লেখা যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠ।

কিংকর্তব্য

সৌদী গ্যাজেটের ৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'জাতির নাড়ি' কলামধারী পৃষ্ঠায় দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটির লেখক ড. আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহিয়া বুখারি 'পরিবর্তন' শিরোনামে সম্প্রতি ইউরোপীয় দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৌদী নাগরিকদের ভিসা প্রদানে যে হয়রানি করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবেদন। উপসংহারে লেখক ব্রাজিলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, ব্রাজিল সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে মার্কিন নাগরিকদের আঙুলের ছাপ দিতে হবে, তা সঠিক সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, 'A human being is a human being, and his dignity does not vary between races, skin, colors and nationalities'। 'আমাদের কী করা উচিত' শিরোনামে লিখেছেন হুসেইন শোরকশি। লন্ডনের একটি আরবী পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সৌদীকরণের যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে সে বিতর্ক তুলে ধরে তিনি বলছেন :

'There must be a fundamental change in the way we deal with expatriates. The message sent to them should change in quality and be more welcoming and practically so.' (*The Saudi Gazette*, 08-02-2004)

ইসলাম

সৌদী গ্যাজেটে প্রায় প্রতিদিন বা দু'একদিন পর পর একটি পাতা থাকে ইসলাম বিষয়ক। আমাদের দেশেও আজকাল ডান-বাম অনেক পত্রিকার শুক্রবারের সংখ্যায় ইসলাম বিষয়ক একটি পাতা থাকে। গ্যাজেটে বাঁ দিকে বড় অক্ষরে ইসলাম এবং ডান দিকে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ থাকে। সঙ্গে একটি বা দুটি ছোটবড় প্রবন্ধ।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ তারিখের পত্রিকায় লস এঞ্জেলেস-এর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ইসলামিক সেন্টারের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াকুব লিখেছেন, 'আপনি নেতা নন কেন?' নীতিবোধ নিয়ে অনুবাদযোগ্য একটি নিবন্ধ।

১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত নাকাতা চাউলার নিবন্ধ 'হিজাব : ভেতর থেকে দেখা' ছাড়া লেখকের নামবিহীন 'মরালিটি এন্ড এথিকস ইন ইসলাম' শীর্ষক রচনা।

১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে নাকাতার প্রবন্ধের শেষাংশ ছাড়া আমেরিকায় ইসলাম প্রসঙ্গে ও খলিফা ওমর সম্পর্কে দুটি ছোট নিবন্ধ রয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থানরত এক মুসলিম বুদ্ধিজীবী লিখেছেন, 'ফরাশি গণতন্ত্রের অন্য মুখচ্ছবি'। তাছাড়া পাকিস্তানের রনেসঁস ইসলামিক জার্নাল থেকে সংকলিত ক্ষুদে নিবন্ধ 'ট্রায়ালস্ অব এফলুয়েন্স'।

২১ ফেব্রুয়ারির পত্রিকায় এম. তকী ওসমানীর প্রবন্ধ বেরুলো 'মহররমের তাৎপর্য' বিষয়ে। পরের দিনও এর প্রকাশ চলল। তাছাড়া রয়েছে ইসহাক জাহিদ-

এর 'আত্মহত্যা মারাত্মক পাপ' এবং রিয়াদ সালুজী'র 'ন্যায়, মধ্যপন্থা ও অনুকম্পার ধর্ম' শীর্ষক লেখা।

২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ইসলামের অর্থনীতি সংক্রান্ত নিয়মকানুন এবং ইসলামিক বর্ষপঞ্জী শীর্ষক দুটি নিবন্ধ। তাছাড়া ড. মোজাম্মেল হকের প্রতিবেদন 'জামারাতে নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত ব্রিটিশ লর্ডের সুপারিশ', যা অন্যত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে খুবই তথ্যসমৃদ্ধ রাসেল রেজা খালিক গানজাগা (লেখক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী) রচিত প্রবন্ধ 'কালো, সাদা এবং রঙিন : ইসলামের পতাকাতলে এক জাতি'। এতে আমেরিকায় ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। একই পাতায় আরেকটি প্রবন্ধ হলো 'মুহাররমে রোজা রাখার ফজিলত'।

পরদিন প্রকাশিত হলো রাসেলের প্রবন্ধের শেষাংশ এবং রিয়াদবাসী লেখক বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্তা লেখক আয়শা কুদশিয়ার আলোচনা, 'আল্লাহ : দা বেস্ট প্ল্যানার' - লেখক মোহাম্মদ আল শরীফ, ওয়াশিংটনস্থ আল-মাগরিব ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট।

১ মার্চের পত্রিকায় ইসলাম বিষয়ক পৃষ্ঠায় যথারীতি কোরআনের একটি আয়াত সহ হিজাব প্রসঙ্গে 'হোয়াই উড আই কভার মাইসেলফ' প্রবন্ধ লিখেছেন নাহীদ মুস্তাফা। তাছাড়া ইবনে আল-কায়িম এর 'সময়ের গুরুত্ব', উসমানের খালিফাত গ্রহণ', 'বিশ্ব মুসলিম যুব সংঘ আয়োজিত সোমালি শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স' সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।

সমকালীন সংস্কৃতি

আরব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা সমকালীন সংস্কৃতিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। এ অধ্যায়ে অনূদিত ও সংকলিত খবরাখবরে তার পরিচিতি বিধৃত। এ দুটি পত্রিকায় মার্কিন চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত শিল্পীদের ছবি ও সংবাদ-নিবন্ধ রয়েছে যেমন তেমনি রয়েছে মুম্বাইর সিনেমা জগতের বহু ছবি ও খবর। চিত্রাভিনেত্রী সুরাইয়ার মৃত্যুর পর সঙ্গীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকরের একটি সাক্ষাৎকার বেশ মর্মস্পর্শী। (*সৌদী গ্যাজেট*, ০১-০৩-২০০৪)

নিছক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত কিছু লেখাও পড়ার সুযোগ হয়েছে। যেমন, ২৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা *সৌদী গ্যাজেটে* মার্কিন কবি উইলিয়াম মেরেডিথ সম্পর্কে একটি সুন্দর সংবাদ-নিবন্ধ রয়েছে। মেরেডিথের নির্বাচিত কবিতা বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। সম্ভবত ১৯৮৩ সালের দিকে একটি আলোচনা সভা উপলক্ষে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা *সৈয়দ আলী আহসান সংবর্ধনা গ্রন্থে* ছাপা হয়েছে। মেরেডিথ এখনো বেঁচে

আছেন। দীর্ঘদিন (১৯৮৩ সাল থেকে) তিনি ছিলেন বাকহীন। ৮৫ বছর বয়সে এখন ইচ্ছার জোরে তিনি আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

একই সংখ্যায় শাম্স আহ্সানের আত্মজিজ্ঞাসা মূলক একটি ছোট লেখা রয়েছে **'ফলোইং দা ডিকটাটস অব আই'**।

একটি পত্রিকার ১ মার্চ সংখ্যায় অন্যতম সম্পাদক ড. মুহাম্মেদ শুকানী-র দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রয়েছে। একটি হলো 'কালচারাল ব্রিজেস', অন্যটি 'কালচারাল ট্রানস্লেশন'।

প্রবন্ধ দু'টি ছোট, কিন্তু সারগর্ভ। প্রথমটিতে উত্তর আমেরিকায় আরবদের সাংস্কৃতিক উৎপাদন নিয়ে কিছু বিতর্কের আভাস দেন তিনি। কেউ কেউ এগুলোর প্রকৃতি ও মূল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেউবা এর মধ্যে জাতিগত নিগ্রহ ও অনুভবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে প্রয়াসী হন। অন্যরা এগুলোকে দুই সংস্কৃতির অভিজ্ঞতার নির্যাসরূপে বিবেচনা করতে বা মূল্যায়ন করতে চান।

সম্প্রতি এই ভাবধারার পরিচায়ক দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। একটির শিরোনাম : *Grape Leaves : A Century of Arab-American Poetry*. অন্যটি আরো বৈচিত্র্যময়। কেননা এটি হলো আরব-আমেরিকান এবং আরব-কানাডিয়ান নারীবাদীদের রচনা সংকলন : *Food for our Grand mother*. Written by Arab-American and Arab-Canadian Feminists. তাছাড়া রয়েছে দুটি সাময়িকী : *জুসুর* এবং *মিজনা*। লেখকের মতে, এর সবটাই যেহেতু ইংরেজিতে রচিত তাই আরব সাহিত্য জগতের বাইরে রয়ে গেছে অনেক আধুনিক ধ্যান-ধারণা।

ফরাশি ভাষায় যে আরবী সাহিত্য রচিত হচ্ছে তাও বিবেচনার বাইরে থাকছে। অথচ এসব সাহিত্য পাঠে আরব সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা লোপ পেতে পারে। বস্তুত, বাংলাদেশের ধীমান সংস্কৃতিসেবীরাও সম্প্রতি আমেরিকা ও কানাডায় সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মে অগ্রণী হয়েছেন বলে জানা যায়। তাই আমাদের জন্যও ড. শুকানীর উত্থাপিত প্রশ্ন বিশেষ বিবেচনাযোগ্য : Are the structures of the mother tongue affected by the structures of the host languages? What is the role of migrants in the process of cultural and linguistic amalgamation, which is a trait of the post-modern world? Does the term 'nationality' still bear the same connotations in European, Arabian or Chinese cultures? And, what role do migration and traveling play in formulating new meanings for the concepts of translation and culture?

'সাংস্কৃতিক অনুবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রয়েছে 'জাতীয় পরিচিতি ও সীমানা দেয়ালের পতন' নামে উপশিরোনাম। এতে প্রথম প্রবন্ধের বর্ধিত বিশ্লেষণ ছাড়াও লেখক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত (১৯৯৭) জেমস ক্লিফোর্ডের *Routes : Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. বইটি

অনুবাদ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তারই ওপর ভিত্তি করে কিছু জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ!

তবে বহির্জগতের সংবাদ পরিবেশনা দেখে এবং পড়ে মনে হয়েছে সৌদী সাংবাদিকদের সম্ভবত ফিলিপাইন, ভারত, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতি প্রীতির নিদর্শন একটু বেশি। বাংলাদেশ সম্পর্কে সাধারণত খারাপ খবরই একটু অধিক পরিমাণে পরিবেশিত। বিশেষ করে এ.এফ.পি পরিবেশিত মহিলা পুলিশের হাতে হরতাল সমর্থকদের নির্যাতনের ছবিই বেশি স্থান পেয়েছে। ব্যতিক্রম দেখা গেছে ড. ইউনুসের সাক্ষাৎকার (*সৌদী গ্যাজেট*, ০৯-০২-২০০৪) এবং তাঁর সঙ্গে কুমিল্লা সফররত স্পেনের রানী সোফিয়ার ছবি বা খবর প্রদানের ক্ষেত্রে। (*এরাব নিউজ*, ১৬-০২-২০০৪।)

এর মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি প্রদর্শিত একটু প্রীতি ও সহানুভূতি আমার কাছে খুবই মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। তা দেখা গেল *সৌদী গ্যাজেট* পত্রিকার রিপোর্টার সৈয়দ এম. আফসার-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় (পৃষ্ঠা : ৫) ছয়টি আলোকচিত্র সম্বলিত একটি ছোট্ট লেখা 'হজ ২০০৪-এর স্মৃতি'- তে। এর সর্বশেষ ক'টি পংক্তি আমাদের কর্মীদের জন্য নিবেদিত। আমি ইংরেজি কথাগুলো এখানে উদ্ধৃত করব :

The unsung heroes : Bangladeshi workers toil day and night to keep each and every inch of the holy shrines clean. Like laborers all over the world, they make light of their hard work and add entertainment to their harsh days by choreographing their sweeping.

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমি ভালো-মন্দ বেশ কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেছি কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সানন্দ স্বীকৃতির এই ক'টি কথা তর্জমা করতে অপারগ!

১৯৭৭ সালে জীবনে প্রথম বাংলাভাষী ঝাড়ুদার দেখেছিলাম মসজিদ আল-হারামের দ্বারপ্রান্তে। সামনের সড়কে বাংলায় ওঁরা কথাবার্তা বলছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা কিছু বললে লজ্জা বোধ করবেন, মনে হলো। কিন্তু এখন তাঁদের দেখেছি মক্কা ও মদিনার মসজিদের অভ্যন্তরে বা বাইরের চত্বরে অনেকটা যেন বুক ফুলিয়ে আপন কর্তব্যসাধনে রত। বড় কথা হল : থাকা-খাওয়া বাদে মাসে টাকার অংকে ৩ থেকে ৫ হাজার কিংবা তারও বেশি একটি আপাতত নির্ধারিত রোজগারের ব্যবস্থা তো আছেই। তাই বা মন্দ কী ? অনেকের কাছে আবার এই যে পবিত্র এলাকায় স্বয়ং আল্লাহর ঘরে বা তার আশেপাশে অথবা তাঁর প্রিয়তম মানুষটির মসজিদে কিছু করবার সুযোগ পাচ্ছেন এতো পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে ! এর বেশি চাওয়া-পাওয়ার কী-ইবা আছে ?

আরব দেশ : চিরন্তন

'জন্ম আমার হাজার বছর আগে
আরব দেশে
সারা ভুবন ঠাঁই দিয়েছে
আমায় ভালোবেসে।'

কাজী নজরুল ইসলাম

দশ লক্ষাধিক বর্গমাইলের ওপর বিস্তৃত আরব দেশ। দেশ না দ্বীপ, নাকি বদ্বীপ : জাজিরাতুল আরব ! এর মধ্যে ৮,৫০,০০০ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত সৌদী আরব।

পূর্বে আরব উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে কুয়েত, ইরাক এবং জর্দানের সীমানা, পূর্বে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান, দক্ষিণে ইয়েমেন এবং দক্ষিণ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র।

দেশটির জনসংখ্যা, বিশেষ করে রাজধানী রিয়াদ, প্রধান সামুদ্রিক বন্দর জেদ্দা এবং পবিত্রতম দুই নগরী মক্কা ও মদীনায় স্থানীয় ও বহিরাগত অধিবাসীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে ওঠানামা করে। আনুমানিক এক কোটি ১০ লক্ষ মাত্র।

প্রশাসনিক কারণে সৌদী আরব পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রথমত কেন্দ্রীয় (নাজদ) প্রদেশ : যার প্রধান শহর রিয়াদ, জাতীয় রাজধানী, সব সরকারী কার্যকলাপের কেন্দ্র, চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা সেবা ও গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ ; বুরাইদা, উনাইযাহ এবং হাইল কৃষি ও পশুপালনের প্রাণকেন্দ্র, পশ্চিম (হেজাজ) প্রদেশ - যেখানে রয়েছে জেদ্দা সমুদ্র বন্দর, বাণিজ্য ও কূটনৈতিক কেন্দ্র। পবিত্রতম দুই নগরী মক্কা ও মদীনা, পর্যটকদের স্বর্গ তায়েফ, সুজলা সুফলা, গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

পূর্ব (আল আহসা) প্রদেশ : প্রধান শহর দাম্মাম বন্দর ও শিল্পনগরী, আল-খোবার ব্যবসা ও বসবাসের শহর, দাহরান - তেল উত্তোলনের প্রধান কেন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। তাছাড়া মরুদ্যানে অবস্থিত আল-কাতিফ ও হোলুফ নামক দুই শহর।

উত্তর প্রদেশ : তাবুক কৃষি ও অবস্থানগত গুরুত্বের নগরী ; আল-জুফ প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, কৃষিনির্ভর শহর।

দক্ষিণ (আসির) প্রদেশ : প্রধান শহর আভা কৃত্রিম সুবিস্তৃত হ্রদের পাশে ৬,৯০০ ফুট উপরে পর্যটক কেন্দ্র ; খামিস মুশাইত সাপ্তাহিক হাটের জন্য বিখ্যাত।

১৯০২ সালে রিয়াদ দখল করে ১৯২৪ সালে ভূখণ্ড একত্রীকরণ সমাপ্ত করলেন সৌদী রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আজিজ। শান্তি ও সমৃদ্ধি এলো ১৯৩২ সালে সরকারীভাবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী বাদশাহ ফয়সল তাঁর দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেলেন। ১৯৭৫ সালে তাঁর ইন্তেকালে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নিবেদিতচিত্তে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

শরীয়া অনুসরণে সৌদী আরবের শাসন ব্যবস্থা, সমস্ত আইন-কানুন বহাল থাকে। পবিত্র কোরআন ও রসুলের (সা.) হাদিস অনুসরণে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা অনুসৃত।

সৌদী আরবের পতাকা সুপরিচিত - সবুজ ভূমির মধ্যখানে একটি তরবারি। তার ওপর আরবীতে লেখা : 'আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল।'

সৌদী আরবের পতাকা কখনো অর্ধনমিত করা হয় না।

কিন্তু এতো হলো সাম্প্রতিক কালের কথা। চৌদ্দশ' বছর আগে কিংবা তারও আগে কী রকম ছিল সে দেশের কিংবা জাজিরাতুল আরব তথা আরব দ্বীপের অবস্থা।

তাঁবুতে বসবাসকারী আরবদের পরিচিত হলো প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সারাসেন রূপে। নিজেদের তাঁরা শুধু আরবই বলতেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড গিয়োমের মতে, 'আরব নামের কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা কখনো প্রস্তাবিত হয়নি।' প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আরবরা এই মরু অঞ্চলে বাস করে আসছেন। বিশাল বিস্তৃত এই দেশ, ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ। বৃষ্টিপাত ঘটে না, কোনো কোনো এলাকায় দশ বছরেও একবার বৃষ্টি হয় না। আবার যখন বৃষ্টি হয় তখন অল্পক্ষণেই আবির্ভাব ঘটে। একদিকে যাযাবর বেদুঈন, অন্যদিকে কৃষিকর্মী সর্বত্র প্রধান বাহন উট। মরুদ্যানে ধান আছে। তবে প্রধান উৎপাদন খেজুর। খেজুর আর উটের দুধ এই দুটোই ছিল প্রধান খাদ্য। শহর-বন্দরগুলোতে ক্রমবর্ধমান স্থায়ী বাসিন্দার প্রধান পেশা হলো ব্যবসা। দেশে-বিদেশে চলতো ক্যারাভানের অভিযান।

ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে নিয়ে আসতো নানা সাংস্কৃতিক নিদর্শন কিন্তু সমাজ চলে নিজস্ব গতিতে। আরব সমাজের কোনো লিখিত আইন-কানুন ছিল না। রাজশক্তি আরোপিত বাধ্যবাধকতাও ছিল না। তবে ঐতিহ্যবাহী কিছু নিয়ম ছিল। যেমন, রক্তের বদলে রক্ত, জীবনের বদলে জীবন। খুনীকে বেঁচে থাকতে দেওয়া নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের জন্য সবচে' অপমানজনক পরিস্থিতি।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আদিম পিতৃতান্ত্রিক আরব সমাজে বিরাজ করতো সাম্য। এক একটি গোত্রের প্রতিটি মানুষ একে অন্যের সমকক্ষ। প্রতি গোত্রে অবশ্য একজন নেতা অর্থাৎ 'সৈয়দ' থাকেন যাঁর কর্তৃত্ব তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানের উপর নির্ভরশীল। দয়াপ্রবণতা, ঔদার্য্য ও মধ্যস্থতা করবার ক্ষমতা তাঁকে নিজের অবস্থানে অটুট রাখার সহায়ক।

ধনী দরিদ্র সমাজে থাকবেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধবিগ্রহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দাস ক্রয় বা গ্রহণ চলতো কিন্তু প্রথা হিসেবে তা দাঁড়ায়নি। কারণ দাসদের মুক্ত করে দিতে হতো বিশেষ করে বেদুঈন সমাজে। অবশ্য মুক্ত দাসকে তার পূর্বতন প্রভুর কাছে নির্ভরশীল থাকতে হতো।

এই অস্থির ও স্থূল সমাজে শিল্পকলা বিকাশের তেমন সুযোগ ছিল না। তবে শব্দ ব্যবহারে কুশলীর ছিল আধিপত্য। আরবরা কাব্যশক্তিকে প্রশংসা করতো। আরব সমাজে কবি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। দৈবনির্ভর হয়ে তিনি নিজের প্রেম, আনন্দ-বেদনা নিয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা বলেছেন। প্রয়োজনে অন্যকে কড়া কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। ব্যঙ্গ, পরিহাস, দম্ভোক্তিতে অন্যকে ঘায়েল করা একজন শক্তিধর কবির খুব স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম রূপে বিবেচিত হতো। গিয়োম অনুসরণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, '... কোরানের পূর্বের কোনো নির্ভরযোগ্য আরব সাহিত্যের প্রমাণ নেই। কৌম-কবিরা ছিলেন কবিতার আকারে ইতিহাসের রক্ষক, যা পুরুষাণুক্রমে পেশাদার শ্রুতিধরদের দ্বারা পুনরাবৃত্ত হতো।' ধর্ম নিয়ে বেশি সময় কাটানো ছিল বেদুঈনদের স্বভাব বিরুদ্ধ। তবে পবিত্র কোরআ'ন অবলম্বনে আমরা জানতে পারি তিন ধরনের ধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব : ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায়।

নানা মূর্তি, জানা-অজানা প্রাণী বা বস্তু নানাভাবে তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতো। কিছু পবিত্র স্থান নির্ধারিত হয়েছিল তীর্থযাত্রার অভিপ্রায়ে। বহু সংস্কার আবদ্ধ করে রেখেছিল সমাজ বিবর্তনের ধারাকে। কেউ কেউ মনে করেন কুসংস্কারের মধ্যেও বেদুঈনদের মধ্যে বাস্তবতা বোধ বেশ প্রখর।

অবস্থানগত দিক থেকে বহিরাগতদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও মরুভূমির দেশে গ্রীক সেনাপতি, ব্যাবিলনের বাদশা, আবিসিনীয় কৃষ্ণ কর্তৃপক্ষের আক্রমণ ঘটেছে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। অংশবিশেষ অধিকৃতও হয়েছে বার কয়েক। আরব প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কিছু কাজও হয়েছে সে সময়ে। খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে গ্রীক ভূগোলবিদ টলেমি আরবের মানচিত্র অংকনের প্রয়াস পান কম-বেশি যথাযথভাবেই। মক্কার নামোল্লেখ করেন তিনি 'MACORABA' বলে। মক্কা বারবার বহির্শক্তির আক্রমণ এবং অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেয়ে যায় অলৌকিকভাবে। প্রধানত ব্যবসায়ী কোরেশ পরিবারসমূহের কর্তৃত্বে মক্কার কেন্দ্রবিন্দু কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক জটিলতার নিরসন হতো।

কিন্তু আরবভূমির বিকাশমান অর্থনীতি ও সামাজিক বিবর্তনের ধারায় মক্কাকেন্দ্রিক একজন মহান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অভিপ্রায়ে তখন তাঁর বাণীবাহক মহাপুরুষ মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম হলো এই মক্কারই কোরেশ বংশে।

এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সূত্রে লব্ধ, বিশেষ করে *এক্রস্-সৌদী এ্যারাবিয়া* এবং মাক্সিম রোদ্যাঁসোঁ-র *মোহাম্মেদ* শীর্ষক গ্রন্থের অনুসরণে আরবভূমির অতীত ও

বর্তমান সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবার প্রয়াস পেলাম। এবার আরব দেশে আমাদের আগ্রহের প্রধান লক্ষ্যসমূহ - **মক্কা** ও কাবা, মদিনা ও মসজিদে নববী এবং তদসংলগ্ন হজরত মোহাম্মদের (সা.) রওজা মোবারক নিয়ে মনীষী সৈয়দ আলী আহসান তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় যে মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি :

'মক্কা একটি রহস্যময় নগরী। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে এই নগরীতে প্রবেশ করবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন এবং প্রবেশ করে স্বস্তি লাভ করেছেন। আরব ভূখণ্ডে বহু নগর স্থাপত্যশিল্পে অতীতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থে মক্কা নগরী কখনো সমৃদ্ধশালী ছিল না। যে স্থানে মক্কা অবস্থিত একসময় সে অঞ্চল ছিল শুষ্ক এবং উষর। এ পথ দিয়ে যাত্রীবাহী উটের কাফেলা চলাচল করতো এবং আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্যারাভানও মক্কা শহরের কাছ দিয়ে যেত। কিন্তু এ সমস্ত কিছু মক্কাকে সমৃদ্ধ করেনি। মক্কা সমৃদ্ধ এবং সম্মানিত হয়েছিল পৃথিবীর পবিত্রতম গৃহের জন্য, যে গৃহকে আমরা কাবাগৃহ বলে থাকি। মক্কা নগরী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর মাতৃসমান। পৃথিবীর সকল বিশ্বাসীর কাছে এই নগরীর ঐশ্বর্য হচ্ছে অলৌকিক ঐশ্বর্য, আত্মার ঐশ্বর্য এবং এমন এক ঐশ্বর্য, যা মানব আত্মাকে উদ্বুদ্ধ এবং অলংকৃত করে। মক্কার পূর্বে একসময় এক সংকীর্ণ উপত্যকার উপর জবল আল উবায়েস নামক পর্বত অবস্থিত ছিল। কাবাগৃহের বেষ্টনীর বাইরে জবল আল উবায়েসের অবস্থান এখনো আছে কিন্তু তার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পর্বতের শিরদেশ সমান্তরাল করে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে এবং পর্বতের পাদদেশ খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাবাগৃহটি প্রস্তরে নির্মিত একটি কিউবের মতো। কালো আবরণ দিয়ে এটাকে ঢেকে রাখা হয়। এর এক কোণে হিজরে আসওয়াদ প্রোথিত আছে। প্রতি মুহূর্তে "অনন্তকাল ধরে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসীগণ কাবাগৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আরব দেশের ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস অনুসারে কাবাগৃহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন হযরত আদম। হযরত আদম ছিলেন মানব জাতির পিতা। হযরত নূহের সময় প্রবল বন্যায় গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর হযরত ইব্রাহীম তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইলের সাহায্যে কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর অনবরত সংস্কার এবং পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে কাবাঘর বর্তমান অবস্থায় এসেছে। তবে এর মূল আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। একসময় চিন্তার অধোগতির এক পর্যায়ে আরব দেশীয়রা কাবাগৃহের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করে। ৩৬০টি মূর্তি কাবাগৃহে স্থাপিত হয়েছিল। রসূলে খোদা এসে চিরকালের জন্য কাবাগৃহকে পৌত্তলিক শাসনমুক্ত করলেন এবং মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করলেন। কাবাগৃহের নিকটেই জমজমের পানির উৎস।

কোনো এক সময় এই জমজম বালু চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। রসূলে খোদার পিতামহ আবদুল মোত্তালেব বহু অনুসন্ধানের পর জমজমকে আবার আবিষ্কার করেন। রসূলে খোদার জন্মের পূর্বে আবদুল মোত্তালেবই ছিলেন কাবাগৃহের খাদেম এবং জমজম কূপের প্রহরী। আরবিতে দুটি শব্দ আছে। একটি হচ্ছে সিকায়া অন্যটি হচ্ছে হাজাবা। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে পানির ব্যবস্থাপক আর দ্বিতীয়টির অর্থ হচ্ছে কাবার পরিচালক। এ দুটোর দায়িত্বই আবদুল মোত্তালেবের উপর ন্যস্ত ছিল। ...

আমার জীবনে কখনো কাবাগৃহ দর্শন এবং তাওয়াফ ও সাঈ করা সম্ভবপর হবে বলে আমি ধারণা করিনি। শুধু এর বিবরণ শুনেছি বিভিন্ন লোকের মুখে, চিত্রদর্শন করেছি এবং সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনে হজের দৃশ্যমান উপকরণ এবং ঘটনাগুলো দেখেছি। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের মতো পবিত্র কাবা আমার কাছে একটি পরিচিত জায়গা। আমি আমার মনের মুকুরে কাবার একটি চিত্র প্রতিফলিত করে রেখেছিলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ কাবাগৃহের সম্মুখে এসে মনে হল ছবিতে যা দেখেছি এবং মানুষের মুখে যা শুনেছি তার কোনোটাই সাক্ষাৎ দর্শনের মতো নয়। সাক্ষাৎ দর্শনটি একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। তখন মনে হল আমি অনন্তকে স্পর্শ করছি, একটি সর্বকালীন প্রত্যাশাকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করছি, একটি বিশিষ্ট জাগরণের মধ্যে জাগরিত হচ্ছি, একটি বিশ্বাসের নিগূঢ়তায় নতুন একটি চৈতন্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপিত দেখছি। এই অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। এই অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মনে হয় আমি আমার সর্বকালের আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। একটি অপরিসীম স্নিগ্ধতায় এবং একটি অনিবার্য মোহনীয়তায় আমি আচ্ছন্ন হচ্ছি। কাবাগৃহের চতুর্দিকে সময়ের কোনো বন্ধন নেই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত এবং এভাবে যুগ যুগ ধরে মানুষের বিরামহীন পরিক্রমা চলছে যার আরম্ভ নেই, শেষ নেই। বিভিন্ন মুহূর্তে গিয়ে দেখেছি কাবাগৃহে চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে চলেছে। কত দেশের মানুষ, কত ভাষার মানুষ, কত বিবিধ আচরণের মানুষ একটিমাত্র বিশ্বাসের সচলতায় কাবাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সকলেই বলছে, 'হে আমার প্রভু, আমি তোমার দাসানুদাস, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে সকল গ্লানি থেকে মুক্ত করো, আমাকে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার এবং সকল কর্মের পাপ থেকে মুক্ত করো, আমাকে পরিচ্ছন্ন করো এবং জ্যোতির্ময় করো।' ক্রন্দনে আকুল অযুত-নিযুত কণ্ঠ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই কথা বলে চলেছে। ...

এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ একটি সংশয়মুক্ত নির্মল সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া, এখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ জীবনের জটিলতা থেকে মুক্ত একটি উদার সময়ের মধ্যে উপস্থিত হওয়া। সকল কর্মের অবসানে একটি অনন্ত

কাল পরিক্রমার মধ্যে আমরা তাওয়াফের সময় উপস্থিত হই। একজন মুসলমানের যথার্থ বিশ্বাস একটি উপলব্ধির স্বাক্ষরে প্রমাণিত হয়, যখন সে কাবাগৃহ পরিক্রমা শেষে আল্লাহর কাছে আপন নিবেদন উপস্থাপন করে। মানুষ এখানে এসে একটি বিশ্বাসের স্রোতধারার মধ্যে নিজেকে প্রবাহিত করতে চায়। যে বিশ্বাস, প্রথম পুরুষ হযরত আদম থেকে আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর সূত্রপাত থেকেই মানুষের বিশ্বাসের উজ্জীবনকে এখানে প্রত্যক্ষ করি।

আল্লাহতায়ালা রসূলকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি, উঠে দাঁড়াও এবং সাবধান বাণী শোনাও; আপন প্রভুর মহিমা ঘোষণা করো, তোমার পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করো এবং অপবিত্রতা বর্জন করো।' এ বাণী শুনে হযরত রসূলে খোদা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন হেরা পর্বতের চূড়ায় যে জ্যোতির্ময় মুখ এবং ছায়া তিনি দেখেছিলেন তাঁর গৃহেও সে জ্যোতির্ময় মূর্তি। হযরত খাদিজা তখন আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ। আপনি আল্লাহর রহস্যের রক্ষক।' ...

স্থাপত্যের কৌশলের দিক থেকে কাবাগৃহ নির্মল, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন এবং অফুরন্ত বিনয় ও প্রেমের উৎস। এই বিনয় এবং প্রেমের সমর্থনে কাবাগৃহ মর্যাদাবান এবং ইসলামী উম্মাহর সকল প্রেরণার কেন্দ্রভূমি। হারাম শরীফের আলোকিত বিপুল চত্বরের মাঝখানে পবিত্র কাবার অবস্থিতি গৃহটিকে একটি অলৌকিক আকর্ষণে মণ্ডিত করেছে। হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের উন্মুক্ততা কাবাগৃহটিকে এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, সহজেই এই উন্মুক্ত এলাকার সঙ্গে কাবাগৃহের স্থাপত্যগত একটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বলে সহজেই ধারণা জাগে। কাবাগৃহের অভ্যন্তরভাগ উন্মুক্ত নয়। কিন্তু চতুর্দিকের উন্মুক্ততা এবং উর্ধ্বাকাশের উন্মুক্ততা কাবাগৃহকে একটি বিপুল উন্মুক্ততার অংশভাগী করেছে। এককভাবে গৃহটি কোনো বিশেষ পার্থিব শিল্পকুশলতা বহন করে না। কিন্তু হারাম শরীফের বিপুল চত্বরের মাঝখানে গৃহটিকে একটি অলৌকিক অবস্থিতি বলে বিশ্বাস জন্মে। কাবাগৃহটি যখন পুনঃনির্মিত হয়, তখন এ গৃহ নির্মাণের সময় পারস্য দেশের স্থপতিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে কিতাব-আল-আগানীতে উল্লেখ আছে। সে সময় কাবাগৃহের দেয়াল ছিল দু'হাত চওড়া এবং গৃহের উচ্চতা ছিল ২৭ হাত। কাবাগৃহের দরজাটি ভূমি থেকে ১১ হাত উঁচুতে। ৬৩৮ সালে হযরত উমরের সময় প্রথম কাবাগৃহের চতুর্দিকে উন্মুক্ত চত্বরের ব্যবস্থা করা হয়। এর পূর্বে চতুর্দিকে বাসগৃহ ছিল। হযরত উমর প্রথম হাজীদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে চতুর্দিকের বাড়িঘরগুলো ভেঙ্গে হারাম শরীফের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই উন্মুক্ত স্থানটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এই উন্মুক্ত এলাকাটি হজের সময়

বহু লক্ষ মানুষের অবস্থানের অনুকূল হয়েছে। উন্মুক্ত স্থানের চারিদিকে একটানা আবরিত স্থান নির্ধারিত হয়েছে। এই স্থানগুলো বহুবিধ খিলানের সাহায্যে অপূর্ব শোভামণ্ডিত। সুউচ্চ মিনারগুলি বিপুল আলোকসম্ভারে সজ্জিত থাকে এবং রাত্রিবেলা অসম্ভব গরম হয় বলে দিনের তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে ঘন পর্দা টেনে কাচ ঢেকে রাখতে হয়। তখন আবার বিদ্যুৎ বাতি জ্বালাতেই হয়। সুতরাং এককথায় বলা যায়, প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার নির্দেশেই এখানকার বাসস্থানগুলো বিশিষ্ট আকৃতি পেয়েছে। ...

মরুভূমির দেশে সূর্যতাপের ভয় আছে, বালুকাঝড়ের ভয় আছে। সুতরাং গৃহনির্মাণের সময় অন্তরাল খুঁজতে হয় তাপ থেকে এবং ঝড়ের উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা থেকে। তাই সেসব অঞ্চলের বাড়িঘরের বারান্দা নেই, জানালাও অনেকটা না থাকার মতো। এর ফলে বিশেষ ধরনের গৃহনির্মাণ আঙ্গিক সেখানে গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা ভারনাকুলার বা দেশজ ভাষ্য বলতে পারি। আরব স্থাপত্য সম্পর্কে বলতে গেলে এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মরুভূমিতে বেদুঈনদের বাসগৃহ হচ্ছে তাঁবু যার চতুর্দিক আবরিত এবং ছাদ হিসেবে একপ্রকার ছুঁচালো বা কৌণিক আচ্ছাদন থাকে। গৃহনির্মাণে এ আকৃতিটি এখানকার আঞ্চলিক দেশজ ভাষ্য। চতুর্দিকের খোলা প্রান্তর থেকে বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে তাঁবুর অভ্যন্তরস্থ অংশ একটি বিশিষ্ট দ্যোতনা লাভ করে। পবিত্র কাবাগৃহের আকৃতিটি লক্ষ্য করবার বিষয়। চতুষ্কৌণিক এ গৃহের কোথাও জানালা নেই। একটি দরজা আছে মাত্র। কিন্তু ছাদটি সমান্তরাল। তাঁবুর ছাদের মত নয়। এভাবে কাবাগৃহটিও এ অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্পের দেশজ ভাষ্য। বর্তমানে মক্কায় যে সমস্ত গৃহ নির্মিত হচ্ছে সেগুলোর নিজস্ব এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে অভ্যন্তরীণ শোভায় সমৃদ্ধ। বাইরে থেকে এগুলো দুর্গের মতো মনে হয়। জানালা প্রায় নেই, অনেক উঁচুতে বায়ুপ্রবেশের পথ আছে কিন্তু তাও বন্ধ থাকে। যেহেতু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এদেশে সর্বজনীন সুতরাং জানালার প্রয়োজন হয় না। গৃহের যত কিছু কারুকার্য তার অধিকাংশ অভ্যন্তরভাগের। নতুন কিছু গৃহে বহিরাঙ্গের শোভা আছে কিন্তু মূলতঃ আরব দেশের স্থাপত্য 'আশ্রয় স্থান' বা শেলটার থেকে, একটি দেশজ ভঙ্গী থেকে গড়ে উঠেছে। কাবাগৃহের আকৃতি থেকেই আরব দেশের মরুভূমির তাঁবু অথবা খেজুর পাতার ছাউনির ঘর তৈরি হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাবাগৃহ একই সঙ্গে যেমন একটি গৃহ তেমনি একটি বিমূর্ত ভাস্কর্য। গৃহটির আকৃতিতে কোথাও পরিমাণগত হেরফের নেই। বিন্যাসগত ব্যতিক্রম নেই - একটি চতুষ্কৌণিক কিউব একটি ভাস্কর্যের নিশ্চয়তায় দণ্ডায়মান রয়েছে। ...

মক্কা শরীফে এবং মদিনা শরীফে মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ সুন্দর মিনারের জন্য। তুরস্কের মসজিদের বৈশিষ্ট্য যেমন গম্বুজের জন্য,

আরব দেশের মসজিদের বৈশিষ্ট্য সে ক্ষেত্রে মিনারের জন্য। হারাম শরীফে কোনো গম্বুজ নেই। কিন্তু সুউচ্চ এবং সুদৃশ্য কয়েকটি মিনার রয়েছে। কিবলামুখী বলে মসজিদগুলো এক এক এলাকায় এক এক ভঙ্গিতে নির্মিত। কোনো মসজিদের কিবলা পশ্চিম দিকে, কোনোটির উত্তর দিকে, কোনোটির দক্ষিণ দিকে - এ রকম। বিদেশীদের কাছে প্রথম হঠাৎ এটা বুঝতে অসুবিধা লাগে। অবশ্য অল্পক্ষণেই তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

গৃহনির্মাণে প্রস্তর এবং ইটের ব্যবহার একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক নিয়ম। এদেশে প্রস্তরের অভাব নেই। মক্কা থেকে মদিনার পথের দু'পাশে পর্বত শ্রেণী চোখে পড়ে।

মক্কা এবং মদিনা প্রত্যেক মুসলমানের ভালো লাগে একটি ভালোবাসার কারণে। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা এ দু'টি নগরীকে অনন্তের প্রতি আসক্তির কেন্দ্রভূমি করেছে। যেমন পৃথিবী এবং বৃষ্টি একে অন্যকে কামনা করে। যেমন নদী এবং সমুদ্র একে অন্যের। যেমন রাত্রি এবং দিবস একে অন্যের প্রতি সমর্পিত তেমনি পৃথিবীর সকল বিশ্বাসী মানুষ এ দুটি নগরীর প্রতি নিবেদিত এবং নগরী দুটিও উম্মাহর সকল প্রাণকে আকর্ষণ করছে। মওলানা জালালউদ্দিন রুমী বলেছেন যে, 'প্রিয়তমার আকর্ষণ না থাকলে প্রিয়তমের আকর্ষণ গড়ে উঠে না। যখন প্রেমের বিদ্যুৎ প্রবাহ হৃদয়ে প্রবেশ করে তখনই হৃদয় প্রেমের আধার হয়। যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হৃদয়কে প্রসারিত করে তখন মনে রাখবে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসছেন। একাকী একটি হাত কখনো তালি দিতে পারে না। তালির শব্দের জন্য দুটি হাতের প্রয়োজন। ঐশ্বরিক যে জ্ঞান সে জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ভালোবাসতে শিখি। আল্লাহর নির্দেশ আছে বলেই পৃথিবীর সর্বত্রই যুগ্মতা বিরাজমান। আকাশ হচ্ছে পুরুষ এবং ধরিত্রী হচ্ছে রমণী। আকাশ যা বর্ষণ করে ধরিত্রী তা ধারণ করে। যখন মৃত্তিকায় তাপ থাকে না তখন আকাশে বহুদূর থেকে এ আলোর অভিষেক লক্ষ্য করা যায়।'

ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে মদিনা শরীফের মসজিদটি প্রথম বলিষ্ঠ নিদর্শন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা শরীফে মসজিদে নববী নির্মিত হয়। এই মসজিদ, রসূলে খোদার বাসগৃহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। মসজিদে নববী ইসলামী স্থাপত্য শিল্পে পৃথিবীতে প্রথম নিদর্শন। তবে এর পূর্বে কুবা মসজিদ নামে খ্যাত অন্য এক মসজিদের কথা উল্লেখ করতে হয়। মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরতের পথে রসূলে খোদা কুবা অঞ্চলে চারদিন অবস্থান করেছিলেন। এই কুবাতে তখন নামাজ পড়বার জন্য যে স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সেখানেই পরবর্তীকালে কুবার বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রসূলে খোদা ২৪ সেপ্টেম্বর কুবায় পৌছান। মদিনায়

পৌঁছে রসূলে খোদা প্রথমেই একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি তার বাসগৃহের স্থান নির্বাচনের জন্য তার উটকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই উট অগ্রসর হয়ে বিশ্রামের জন্য যেখানে থেমেছিল সেখানেই রসূলে খোদা তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। উট যেখানে থেমেছিল সেই জমি ছিল নাজার গোত্রের সাহাল ও সোহায়েল নামক দুই এতিম বালকের জমি। রসূলে খোদা উক্ত জমি ক্রয় করেন এবং সে জমিতে তাঁর বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। এই বাসগৃহ এবং মসজিদ নির্মাণে সাত মাস বা তার অধিক সময় লেগেছিল। প্রথমে এই বাসগৃহ এবং মসজিদ অতি সাধারণভাবেই নির্মিত হয়েছিল। এতে কোনো ছাদ ছিল না। শুধু দেয়াল ছিল। পরে সামনের দিকে আংশিকভাবে ছাদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদটি পৃথিবীর একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থাপত্য। মসজিদে প্রবেশের জন্য কয়েকটি দরোজা ছিল। তার একটি দরোজা বাব জিব্রিল নামে বিখ্যাত। হযরত জিব্রাইল (আ.) এই দরোজা দিয়ে রসূলে খোদার গৃহে প্রবেশ করতেন বলে এটাকে বাব জিব্রিল বলা হয়। বর্তমানে মসজিদটি বিস্ময়করভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং একসঙ্গে মসজিদের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক মানুষ যাতে নামাজ পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্মাণের বৈশিষ্ট্যে এ মসজিদটি একটি অনন্য সাধারণ শিল্প প্রজ্ঞার নিদর্শন বহন করে। ...

বিপুল আয়তনের এই মসজিদটি স্থাপত্য সজ্জায় অপরূপ এবং পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে খিলানযুক্ত আবরিত অংশ। মাঝখানে বিপুল উন্মুক্ত চত্বর। সম্মুখভাগে প্রশান্ত বিস্তৃত পরিসরের একপাশে রসূলে খোদার রওজা মোবারক এবং অন্যত্র নামাজ পড়ার ব্যবস্থা। এখানে উপস্থিত হয়ে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তা পৃথিবীর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষ বলতে থাকে : আমি আল্লাহর প্রিয় রসূলের সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আমি সেই মহান নবীর দরোজায় হাজির হয়েছি, যার শাফায়াত আল্লাহর দরবারে অবশ্যই কবুল হবে। এ মহান দরবার থেকে কেউ নিরাশ হয় না। কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না। হে আল্লাহ, তোমার প্রিয়তমের দরবার থেকে আমিও খালি হাতে ফিরে যাবো না, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি।

সকল মানুষ যখন রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে রসূলকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তখন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে যে কলগুঞ্জন নির্মিত হয় তা অতুলনীয়। সকলেই বলতে থাকে : 'আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ - আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবীউল্লাহ, আসসালাতু ওআসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল

মুরসালীন, আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া খাতামুন নাবীঈন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লীল আলামীন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনাবীন' - এই সালাম প্রদর্শনের পর নানাবিধ প্রার্থনায় আকুল কণ্ঠস্বরগুলো উচ্চকিত হতে থাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ়, আবেগে উচ্চকিত এবং পরম সৌভাগ্যে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সকলেই বলতে থাকে : 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার সহায়তা এবং শাফায়াত কামনা করি এবং আপনার উপলক্ষে আল্লাহর দরবারে এই আবেদন পেশ করি যেন আপনার দ্বীন এবং আপনার আদর্শের পূর্ণ অনুসারী অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়।'

সকল অনুভূতি হয়তো শব্দে বাঙ্ময় করা যায় কিন্তু মসজিদে নববীতে রওজা মোবারকের সামনে একজন বিশ্বাসীর চিত্তে যে অনুভূতি জাগে তাকে কোনো শব্দের ব্যাখ্যায় মূর্ত করা যায় না। আমার মনে হয়েছিল যেন একটি অনন্ত কাল পরিক্রমায় আমি একটি জাগরুক সত্তার সম্মুখে এসে উপনীত হয়েছি। আমার মনে হয়েছিল জীবনের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমি একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আপনাকে নিঃশেষ করছি। সে আকাঙ্ক্ষা সত্যে সমাবৃত হওয়ার, সে আকাঙ্ক্ষা প্রেমে সঞ্জীবিত হওয়ার, সে আকাঙ্ক্ষা নিবেদনে একান্ত হওয়ার এবং সে আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসের গভীরতায় অবগাহন করার। একজন মানুষের জীবন কি করে কখন সার্থক হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সহজে কেউ দিতে পারে না। আমার মনে হয় মানুষ যখন আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারে তখন একটি পরিচ্ছন্নতার প্রশান্তির মধ্যে তার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণের মধ্যেই তার সার্থকতা।

...

ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর আরব জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে এবং সে সমস্ত স্থানকে কুসংস্কারমুক্ত করেছে। সূচনালগ্নের সেই সৌভাগ্যের কথা আমরা যদি স্মরণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই কিভাবে সেই যুগের মানুষ সমুদ্র পার হয়েছে, পাহাড় অতিক্রম করেছে এবং দুর্গম অপরিচিত স্থানে নতুন বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে তারা তুখারিস্তানে পূর্ণ প্রতাপ নিয়ে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুখারিস্তান ছিল তখন বৌদ্ধদের সাধনকেন্দ্র। অজস্র বৌদ্ধ মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত ছিল। সেখানকার মানুষ তাদের নির্জন প্রকোষ্ঠ এবং প্রতিমার বন্ধন ছেড়ে ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রতাপী আরবগণ অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করেনি। সে সময় আরবরা যে সমস্ত অঞ্চলে গিয়েছিল সে সমস্ত এলাকার সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়েছিল। তাই আজ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরব সংস্কৃতিকে পাই না কিন্তু আপন আপন স্বদেশের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য করি।

উম্মাহ শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে, একই বিশ্বাসে বলীয়ান এবং সমৃদ্ধ বিশ্ব মানবগোষ্ঠী। এখানে দেশ কাল এবং ভৌগলিক প্রত্যয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় না। এখানে দেশ কাল অতিক্রান্ত একটি প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটে। মক্কা শরীফে এসে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে এবং মসজিদে নববীর ভেতরে আমি বিশ্ব মানবতার একীকরণের নিদর্শন দেখেছি। কত দেশের মানুষ যে এখানে আসে তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ এবং বিভিন্ন ইতিহাসের মানুষ একই ইচ্ছায় এখানে মিলিত হয়। সেই ইচ্ছা হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং বিশুদ্ধতার আর পরিচ্ছন্নতার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা। পৃথিবীতে বিস্ময় আছে অনেক কিন্তু পরম বিস্ময় এটাই যে, বহুযুগ অতিক্রান্ত হলেও একই প্রকৃতির আচার নিষ্ঠার মধ্যে বিশ্বের অগণিত মানুষ একত্রিত হচ্ছে এবং সম্মিলিত কণ্ঠে বলছে : 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' - হে প্রভু আমি উপস্থিত। মানুষের জ্ঞান অর্জিত এবং অসম্পূর্ণ কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান মৌলিক, সম্পূর্ণ ও চিরন্তন। সৃষ্টি সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞান সৃষ্টির অস্তিত্বের পর অর্জিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত আল্লাহর জ্ঞান পূর্ব ও আদি। ভূত ও ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান এবং আগামীকাল সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে জাগ্রত হয়েছে। তিনি তো অন্তর্যামী মানুষের জ্ঞান কখনোই নির্ভুল নয়। মানুষ, ঘটনা এবং সৃষ্টি অনুষ্ঠানের অংশ মাত্র। কিন্তু তার অধিকারী নয়। ভবিষ্যতে কি হবে সে কিছুই জানে না। সেই কারণে অসম্পূর্ণ মানুষ পূর্ণ প্রজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ করে। হজ এবং ওমরাহ এই আত্মসমর্পণেরই নিদর্শনসমূহ।'

প্রশ্ন জাগে : একই সঙ্গে বিদ্রোহী ও বুলবুল, বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেন তাঁর জন্ম হাজার বছর আগে আরব দেশে বলে ঘোষণা দিচ্ছেন? বিশ্ব তাঁকে ভালোবেসে ঠাঁই দিয়েছে বলে? নিছক কবি-কল্পনা? না ধর্মাসক্তির উন্মাদনা? আর এক যুবক ব্যবসায়ী আরব কেন আমার পরিচিতি-পত্র হাতে নিয়ে জিগ্যেস করে : তুমি তো কোরেশী, ওখানে গেলে কী করে? কবে?

হায় আল্লাহ! কাকে কী বোঝাব? সপ্তম শতক থেকে ওঁদেরই পূর্বপুরুষ এদিকে গমনাগমন করেছেন কত। কেউ কেউ অবস্থান করেছেন চিরস্থায়ীভাবে। ইতিহাসই তো তার প্রমাণ। তবে সব রহস্যের হবে কি সমাধান?

...

গ্রন্থপঞ্জি

সৈয়দ আলী আহসান, *হে প্রভু আমি উপস্থিত*, ঢাকা, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

সৈয়দ আলী আহসান, *মহানবী*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, আগস্ট, ১৯৯৪।

এ.এফ.এম. আবদুল জলীল, *আরবের পথে প্রান্তরে*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০১/অগ্রহায়ণ ১৪০৮।

মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ, *হজ্জ পালনের অভিজ্ঞতা, তাৎপর্য, শিক্ষা ও উপলব্ধি;* পরিবেশনায় : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মিয়া (আলহাজ্ব), *মুইনুল হুজ্জাজ* (হজ্জ গাইড), তৃতীয় প্রকাশ, ২০০২ (১৯৯৩)।

বেগম রুনু সিদ্দিকী, *আমার ভালবাসার তীর্থ মক্কা ও মদীনা*, চট্টগ্রাম, ১৯৯৬।

মাহবুবুর রহমান ও নূরুন নাহার (আলহাজ্ব প্রফেসর ও আলহাজ্ব অধ্যাপক), *মক্কা মদিনার পথে*, ঢাকা, ১লা ডিসেম্বর, ২০০৩।

রফিকুল করিম চৌধুরী, *হজের ডায়েরী*, ...

মিন্নাত আলী (অধ্যক্ষ), *আমার হজ পালন : স্বপ্নভঙ্গ*, ঢাকা, মনিহার প্রকাশনী, ২০০৪।

আলফ্রেড গিয়োম, *ইসলাম*, মোজাফফর হোসেন অনূদিত, ঢাকা; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭।

... *পবিত্র হজ্ব ও উমরাহ* (ছোট নোট বইয়ের মত), পৃ. ৬২।

... *আহকামুল হজ্জ*, ঢাকা, শ্রাবণ ১৩৮৯, প্রকাশনায় : বাংলাদেশ হাজী মজলিস।

... *হজ্জ : উমরা : যিয়ারত*, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮, প্রকাশনায় : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

... *হজ্জ, উমরাহ ও মসজিদে রাসূল* (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)।

যিয়ারতের নির্দেশিকা, সৌদী প্রকাশনা, ১৪২৪ হিঃ।

কাজী মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ (ডা.), *আত্মশুদ্ধির ক'টি কথা*, নতুন মাছায়েল সম্বলিত ১১শ সংস্করণ, ২০০২।

শাহেদ আলী অনূদিত *মক্কার পথ*, ঢাকা, ১৯৮৪: translation of *The Road to Mecca* by Muhammad Asad alias Leopold Weis.

History of Makkah, Prepared by a Group of Scholars under the Supervision of Shaikh Safiur Rahman Mubarakpuri, Translated by Nasiruddin al-Khattab, Riyadh : Dar-us-Salam, 2002.

Alfred Guillaume, *Islam* Penguin Books, LOrdon, 1961,

A.H. Dani, 'Early Muslim Contact with Bengal', *The Preceedings of the All Pakistan History Conference,* Karachi, 1951, pp. 162-202.

J. J. Reinaud, *Relations des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et la Chine dans le 9e siegcle,* Paris, 1845, t. I, p. xxxiv.

Across Saudi Arabia, no date, Saudia publication (personal collection from Paris), 6.10.1977.

Maxime Rodinson, *Mohammed;* translated from French by Anne Carter; London, 1974.

Muhammad Ilyas Abdul Ghani (Dr.), *History of Madinah Munawwarah, Madinah,* 2003 AD.

A Guide to Hajj, Umra and Visiting the Prophet's Mosque, Riyadh, 2003.

Syed Ali Ahsan, *Muhammad, Seal of the Prophets;* translated by Mohammad Alamgir, Kualalampur, 2001.

Daily newspapers : *The Saudi Gazette,* Zedda, 2004; *Arab News,* Zedda, 2004, *Daily Ittefaq.*

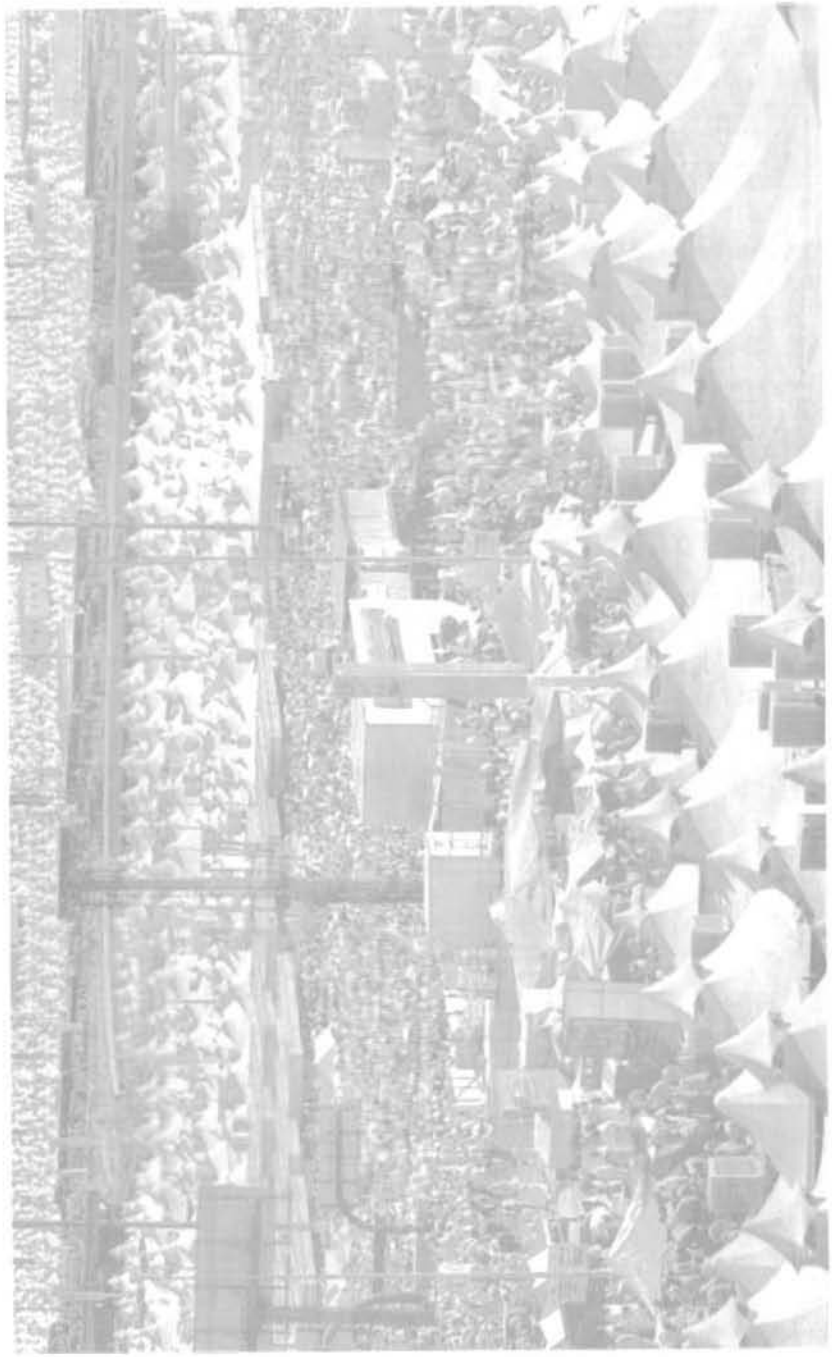

ফটো : আতা-এ মওলা

ফটো : আন্তা-এ মওলা

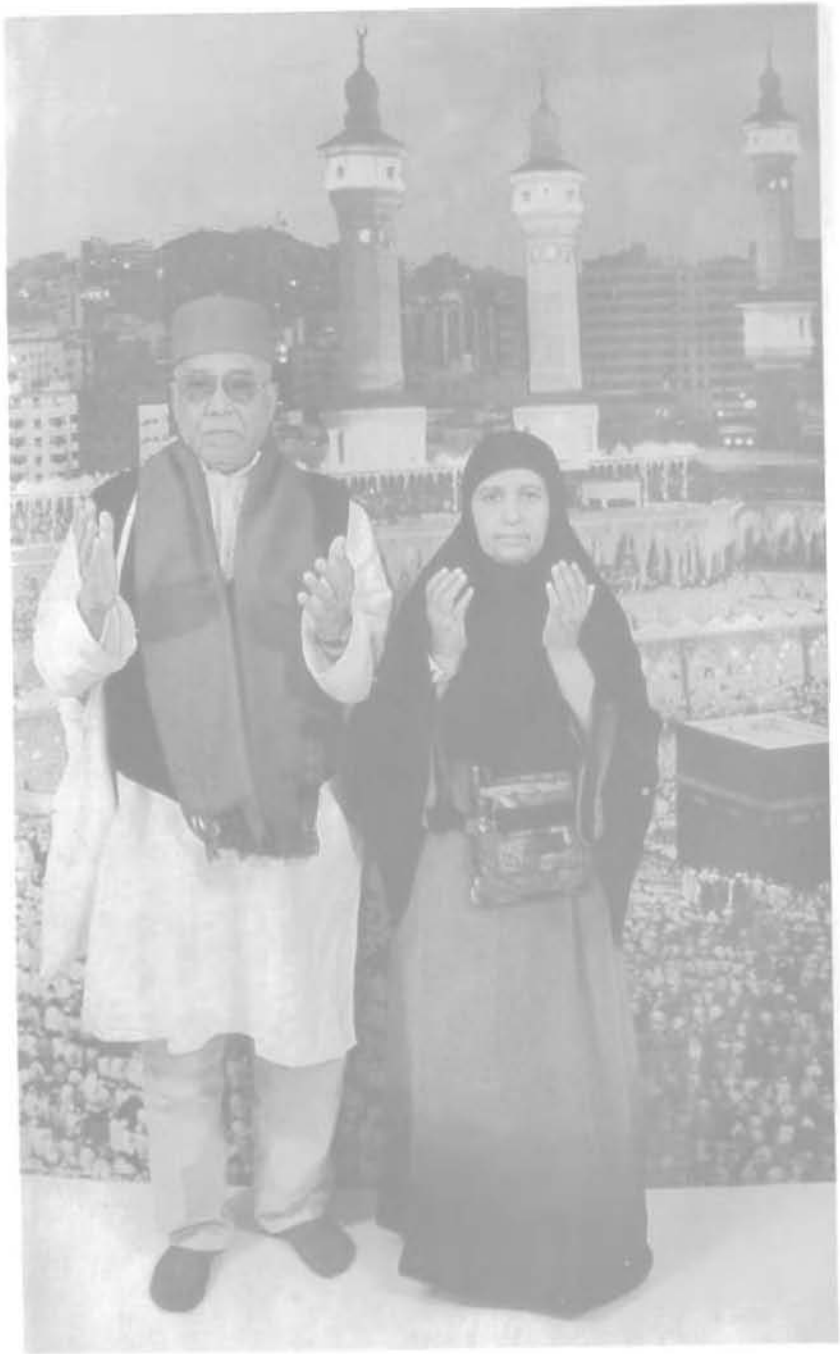

সামনে উপবিষ্ট : ড. কোরেশী, মিসেস নাসরীন কোরেশী, প্রসন্না ও প্রমা, চিত্রা।
দাঁড়িয়ে : সোহেল, পূষণ, রুম্পা, পাপ্পু, রুবেল, লালমোতি।

প্রফেসর জোসেফ টি. ও' কনেল, ড. কোরেশী, মিসেস নাসরীন কোরেশী।
(ইনসেটে) রা'দ মাহমুদ শাহ কোরেশী